অস্কার ওয়াইল্ডের সেরা রূপকথা

চিরায়ত গ্রন্থমালা

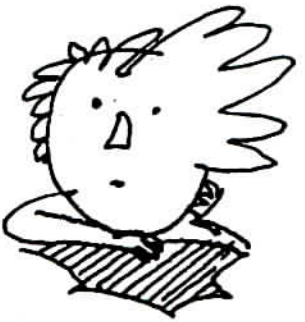

banglabooks.in

আলোকিত মানুষ চাই

অস্কার ওয়াইল্ডের সেরা রূপকথা

সম্পাদনা
আমীরুল ইসলাম

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৯২

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ফাল্গুন ১৩৯৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

পঞ্চম সংস্করণ অষ্টম মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
ধ্রুব এষ

মূল্য
পঁচাত্তর টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0091-8

গল্প পাঠের আগে

জীবন নয় যেন একটি নাটক !

উত্থান-পতন, চড়াই-উৎরাই, আনন্দ-বেদনার এক উপাখ্যান—কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম অস্কার ওয়াইল্ড। ইংরেজি সাহিত্যের বেগবান এক পুরুষ তিনি। তীক্ষ্ণ, মেধাবী, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, দিব্যকান্ত সুপুরুষ, বাগ্মী অস্কার ওয়াইল্ড জন্মগ্রহণ করেছিলেন আয়ারল্যান্ডে—১৮৫৪ সালে, ১৫ অক্টোবর। অভিজাত, উচ্চবংশে তাঁর জন্ম। বাবা-মা দুজনেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে খ্যাতিমান। ছাত্রজীবন গৌরবময়। অসাধারণ মেধা ও মননজাত এই প্রতিভা পড়তে গিয়েছিলেন অক্সফোর্ডে। তৎকালীন সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে বন্ধুত্ব। এক আশ্চর্য সুন্দর জীবন।

অক্সফোর্ডের জ্বলন্ত আগুন অস্কার ওয়াইল্ড। দীপ্যমান, অগ্নিক্ষরা বাক্যভাষণ। যেখানেই যান সমাদর জোটে, যে-কোনো মেধাবী আড্ডায় স্বমহিমায় ঝলসে ওঠেন। সেই ছাত্রবয়সেই, ১৮৭৪ সালের দিকে, সাহিত্যরচনায় অস্কার ওয়াইল্ডের মনোনিবেশ। নিজের প্রতিভায় আস্থাবান। জানতেন, তিনি বিখ্যাত হবেন। লিখলেন কবিতা। দ্রুত সংস্করণ নিঃশেষিত হল। যে-কোনো সভায়, যে-কোনো আসরে—অস্কার ওয়াইল্ড সবার কাঙ্ক্ষিত পুরুষ। নাটক এবং গল্প লিখেও আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। বক্তা হিসেবেও খ্যাতির শীর্ষে তাঁর আরোহণ। কিন্তু যে-বইটি তাঁকে অতিদ্রুত বিশ্বখ্যাতি এনে দিল, সেটি একটি রূপকথার গল্প-সংকলন। দি হ্যাপি প্রিন্স অ্যান্ড আদার টেলস। প্রকাশিত হল ১৮৮৮ সালে। খ্যাতির স্বর্ণ-সিংহাসনে বরণীয় হলেন। সাহিত্যের ইতিহাসে এ-ও আশ্চর্য এক ব্যতিক্রম।

অস্কার ওয়াইল্ড সর্বস্ব উজাড় করে লেখালেখি শুরু করলেন। রাজকীয় তাঁর জীবন-যাপন। বেশভূষা, চালচলন সবকিছুতেই ফুটে উঠল তৎকালীন সমাজের সেরা আভিজাত্য। অস্কার ওয়াইল্ডের যে-কোনো রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য—শিল্পের জন্য শিল্প। সৌন্দর্য সৃষ্টি করে শিল্পকে। সাহিত্য সেই চির মহত্তম মাধ্যম—যা ধারণ করে জীবনের গাঢ় রহস্য এবং অপার সৌন্দর্য।

কিন্তু তাঁর রূপকথাগুলো চির-নতুন অমর সৃষ্টি হল কেন?

শিশু-কিশোরদের জন্য অস্কার ওয়াইল্ডের গল্প খুলে দেয় মায়াবী তোরণ। রূপক কল্পনার তীব্র উদ্ভাস গল্পের প্রতিটি ছত্রে-ছত্রে। বয়স্ক পাঠকদের জন্য উন্মোচিত হয়

স্বপ্নাক্রান্ত ব্যঞ্জনাময় গভীর জীবন-সত্য। এ-কারণে অস্কার ওয়াইল্ডের রূপকথা পৃথিবীর চিরকালের সম্পদ। সর্বদেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য। ১৮৮৮ সালে Happy Prince and other Tales এবং ১৮৯১ সালে দ্বিতীয় গ্রন্থ A House of Pomegranatas নামের রূপকথার গল্প-সংকলন দুটি প্রকাশিত হয়।

অস্কার ওয়াইল্ডের অন্যান্য রচনার পাশাপাশি এই রূপকথার গল্প-সংকলনটি তাঁকে অমরত্ব এনে দেয়। মৌলিক, সৃজনী-প্রতিভায় উজ্জ্বল, অভিঘাতসম্পন্ন সুন্দর এই রূপকথাগুলোর কোনো তুলনা হয় না। সেই অসাধারণ গল্পগুলো থেকে কয়েকটি নির্বাচিত গল্পের সংকলন এই বইটি। সকল বয়সী পাঠকের জন্য খুলে দেবে স্বপ্নজগতের কল্পলোকের নিপুণ এক জগৎ।

বইটি পাঠকদের প্রত্যাশা পূরণ করলে শ্রম আমাদের সার্থক।

আমীরুল ইসলাম
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
২.২.১৯৯২

banglabooks.in

সূচিপত্র

একটি গোলাপের জন্য ॥ ৯
অনুবাদ ॥ হায়াৎ মামুদ

সুখী যুবরাজ ॥ ১৫
অনুবাদ ॥ হায়াৎ মামুদ

তারা থেকে ঝরা ॥ ২৪
অনুবাদ ॥ বুদ্ধদেব বসু

স্বার্থপর দৈত্য ॥ ৩৬
অনুবাদ ॥ বুদ্ধদেব বসু

জন্মদিন ॥ ৪০
অনুবাদ ॥ অর্ণব রায়

একটি গোলাপের জন্য

'যদি আমি লাল গোলাপ এনে দিতে পারি তাহলে মেয়েটি আমার সাথে নাচবে', তরুণ ছাত্রটি মনে-মনে বলতে থাকে, 'কিন্তু সারা বাগানে আমার একটিও গোলাপ নেই।'

হোম-ওক গাছের উপরে বুলবুলের বাসা; সে তার ঘর থেকে ছেলেটির কথা শুনতে পেল। লতাপাতার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। সে দেখল—ছেলেটি বলছে, 'সারা বাগানে আমার একটিও গোলাপ নেই', আর পানিতে ভরে যাচ্ছে তার সুন্দর চোখ। ছেলেটি বলছে, 'হায়রে, কী অল্প জিনিসের ওপরই-না আমাদের শান্তি নির্ভর করে! জ্ঞানী-গুণীরা যা-কিছু লিখেছেন সবই আমি পড়েছি, দর্শনশাস্ত্রের সব গূঢ় তত্ত্ব আমার জানা; তবু একটি মাত্র গোলাপের জন্যে আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে গেছে।'

বুলবুল সমস্ত কথা শুনতে পেল, তারপর নিজের মনেই বলে উঠল, 'এতদিনে আজ আমি একজন খাঁটি প্রেমিকের সাক্ষাৎ পেলাম। যদিও তখন একে আমি চিনতাম না, রাতের পর রাত আমি গান গেয়ে-গেয়ে এর কথাই তো বলেছি; রাতের পর রাত তারাদের কানে-কানে এর গল্পই তো আমি করেছি ;—আর এতদিন পরে আজকে এর দেখা পেলাম। হায়াসিন্থের ফুলের মতো তার চুল, আর ঠোঁট তার বাসনার গোলাপের মতোই রক্তিম; কিন্তু আবেগে-উত্তেজনায় সারা মুখ তার ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, দুঃখ ওর কপালে বাসা বেঁধেছে।'

তরুণ ছাত্রটি তখনো বিলাপ করছে, 'রাজকুমারী আগামীকাল রাত্রে বল্‌নাচের অনুষ্ঠান করবে, আমি যে-মেয়েকে ভালোবাসি সে-ও নাচের আসরে আসবে। একটি গোলাপ তাকে দিলেই সকাল অবধি সে আমার সাথে নাচবে বলেছে। যদি একটি গোলাপ দিতে পারি তাকে, তার হাতে হাত রেখে আমি নাচতে পারব, তার মাথা আমার কাঁধে এলিয়ে পড়বে, হাত তার

আমার হাত আঁকড়ে ধরে থাকবে। কিন্তু হায়! আমার বাগানে যে একটিও গোলাপ নেই; তাই একা বসে থাকতে হবে আমাকে আর সে আমার পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করবে। আমাকে তখন সে চোখেই দেখবে না; আমার বুক ভেঙে যাবে তাহলে।'

'সত্যিই, এই হল আসল প্রেমিক', বুলবুল মনে-মনে বলল। 'এখন আমি যা-ই গাইব ও কষ্ট পাবে; আমার কাছে যা আনন্দ, ওর কাছে তা-ই যন্ত্রণা। ভালোবাসা সত্যিই এক অত্যাশ্চর্য বস্তু। ভালোবাসা পান্নার চেয়েও মূল্যবান, উপল মণির চেয়েও প্রিয়তর। মণিমুক্তো দুর্লভ বস্তু। কোনোকিছু দিয়ে তাকে কেনা সম্ভব নয়, বাজারের মধ্যে একে বিক্রিও করা যাবে না। কোনো সওদাগরের কাছ থেকে তাকে কিনতে পাওয়া যাবে না, আর সোনা দিয়েও তো ভালোবাসাকে ওজন করা যায় না।'

'বাজিয়েরা গ্যালারিতে বসে থাকবে', তরুণ ছাত্রটি বলতে থাকে, 'আর তাদের নানারকম তারযন্ত্র বাজাবে, আর সে বীণার শব্দে, বেহালার সুরে-সুরে নাচবে। মেঝেতে তার পা পড়বে না এমন হালকাভাবে সে নাচতে থাকবে, ঝকঝকে পোশাক-পরা রাজকর্মচারী সভাসদবর্গ সকলে তার চারপাশে এসে ভিড় জমাবে। কিন্তু হায়! আমার সঙ্গে সে তো নাচবে না, আমি-যে তাকে একটিও লাল গোলাপ দিতে পারিনি।' ছেলেটি বাগানের ঘাসের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল, দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

সেখান দিয়ে একটা সবুজ গিরগিটি যাচ্ছিল, হাওয়ায় সে তার লেজ নাড়ছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'আরে ও কাঁদছে কেন?'

'তাই তো। কেন?' জিজ্ঞেস করে উঠল প্রজাপতি। সূর্যের আলোয় সে নেচে বেড়াচ্ছিল।

'তাই তো। কেন?' পাশের বাড়ির ডেইজি ফুল হালকা নরম সুরে জিজ্ঞেস করে উঠল।

বুলবুল বলল, 'ও কাঁদছে একটি লাল গোলাপের জন্যে।'

'একটা লাল গোলাপের জন্যে?' তারা সবাই একসঙ্গে অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী মজার কথা!' আর ছোট্ট গিরগিটি—তার বেজায় নাক উঁচু—সে তো হো-হো করে হেসেই উঠল।

বুলবুল কিন্তু ছাত্রটির মনের দুঃখ ঠিক বুঝেছিল। সে চুপচাপ তার ওকগাছের বাসায় বসে রইল আর ভালোবাসার রহস্যের কথা ভাবতে লাগল।

তারপর কী ভেবে হঠাৎ বুলবুল তার খয়েরি ডানা মেলে ধরল বাতাসে, বাতাস কেটে-কেটে উড়ে চলল। লতাপাতা-ঘেরা কুঞ্জের উপর দিয়ে ছায়ার মতো ভেসে গেল সে, ছায়ার মতোই বাগানের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ভেসে গেল।

বাগানের শেষে ওদিকটাতে সবুজ ঘাসে-ভরা এক-ফালি জমি। তার মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর একটি গোলাপগাছ। বুলবুল তাকে দেখতে পাওয়া মাত্র সেখানে উড়ে গেল এবং তার সুন্দর ডালে গিয়ে বসল।

বলল, 'আমাকে একটা গোলাপ দাও-না, আমি তাহলে আমার সবচেয়ে যে ভালো গান সেটি তোমাকে শোনাব।'

গাছটি কিন্তু মাথা নাড়ল।

'আমার গোলাপ তো শাদা রঙের', উত্তর দিল সে, 'সমুদ্রের ফেনার চেয়েও শাদা, পাহাড়চূড়োর বরফের চেয়েও শাদা। বরং তুমি আমার ভাইয়ের কাছে যাও। সূর্য-ঘড়ির পাশে সে থাকে। হয়তো তুমি যা চাও, সে তা দিতে পারবে।'

বুলবুল আবার উড়ল। উড়ে গেল সূর্য-ঘড়ির ওখানে, যার চারপাশে অনেক গোলাপগাছ। বলল, 'আমাকে একটা গোলাপ দাও-না, আমি তাহলে আমার সবচেয়ে যে ভালো গান সেটি তোমাকে শোনাব।'

গাছটি কিন্তু মাথা নাড়ল।

'আমার গোলাপ যে হলদে রঙের', সে উত্তর দ্যায়, 'সমুদ্রের মধ্যে স্ফটিকের আসনে যে-মৎস্যকন্যা[২] বসে থাকে, তার চুলের চেয়েও বেশি হলুদ আমার গোলাপ, সামনের মাঠে যে ড্যাফোডিল[৩] ফোটে, তার রঙও এত হলুদ নয়। তুমি বরং আমার ভাইয়ের কাছে যাও। সে ঐ ছাত্রটির জানালার নিচে থাকে। তুমি যা চাও তা হয়তো সে দিতে পারবে।'

বুলবুল আবার উড়ে চলল সেই গোলাপের কাছে, ছাত্রটির জানালার নিচে যার ঘর। এখানেও সেই একই প্রার্থনা জানাল সে। বলল, 'আমাকে তোমার একটি গোলাপ দাও, আমি তাহলে আমার সবচেয়ে ভালো গান তোমাকে শোনাব।'

কিন্তু মাথা নাড়ে গোলাপগাছ।

'আমার ফুল লাল', বলল সে, 'ঠিক পায়রার পায়ের মতো লাল। সাগরের নিচে যে- প্রবালের পাখা সাগরের গুহায় তরঙ্গ তোলে, তার চেয়েও বেশি লাল। কিন্তু শীতে আমার সমস্ত শিরা-উপশিরা জমে গেছে, তুষার আমার সমস্ত কুঁড়িগুলো মেরে ফেলেছে, ঝড় এসে সব ডালপালা ভেঙে দিয়েছে; এ-বছর আমার ডালে একটিও গোলাপ ফোটেনি।'

'কেবল একটিমাত্র গোলাপ আমার দরকার', বুলবুল অনুনয় করতে থাকে, 'শুধু একটি মাত্র গোলাপ! কোনো উপায় কি নেই যাতে আমি পেতে পারি?'

'উপায় অবশ্য আছে', গোলাপগাছ বলল, 'কিন্তু তা এত ভীষণ-যে তোমাকে বলতে আমার সাহস হচ্ছে না।'

'না, তুমি বলো। আমি ভয় পাব না', উত্তর দিল বুলবুল।

গাছটি তখন বলতে লাগল, 'তুমি যদি একটি লাল টকটকে গোলাপ চাও, তাহলে জোছনা-রাতে গান গেয়ে তাকে ফোটাতে হবে আর তোমার বুকের লালরক্তে সেই গোলাপে রঙ ধরবে। তুমি আমার গাছের কাঁটার উপরে বুক পেতে রেখে আমাকে গান শোনাবে। সারারাত ধরে তুমি গান গাইবে আর আমার কাঁটা তোমার বুকের মধ্যে একটু-একটু করে ঢুকবে, তোমার গায়ের সমস্ত রক্ত কাঁটার ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হবে এবং তা আমার রক্ত হয়ে যাবে।'

'একটি গোলাপের জন্য মৃত্যু অবশ্য বড্ড বেশি দাম', বুলবুল জবাব দিল, 'আর জীবন তো সকলের কাছেই বড় প্রিয়। সবুজ গাছগাছালির উপর বসে থাকতে কী আরাম! সূর্য তার সোনার রথ চালাবে, আর চাঁদ তার মুক্তোর রথ—কী আনন্দ এ সব দেখতে। হথর্ন ফুলের গন্ধ, পাহাড়ি উপত্যকায় ঘাসের ফাঁকে-ফাঁকে লুকিয়ে-থাকা ব্লু বেল, আর পাহাড়ের উপরে খুশি ঝল্‌মল্ হিদারের গন্ধ কী মিষ্টি! কিন্তু তবু, ভালোবাসা তো জীবনের চেয়ে বড়, আর একজন মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে কি একটা পাখির হৃদয়ের কোনো তুলনা চলে!'

তাই আবার সে তার খয়েরি ডানা বাতাসে মেলে ধরল, বাতাস কেটে-কেটে উপরে উঠতে লাগল। সারা বাগানের উপর দিয়ে ছায়ার মতো সে ছুটে গেল, কুঞ্জের ভিতর দিয়ে ছায়ার মতো সাঁতার কেটে গেল।

বুলবুল যেখানে দেখে গিয়েছিল, তরুণ ছাত্রটি তখনো সেখানে ঘাসে শুয়ে ছিল। তার সুন্দর চোখ থেকে তখনো পানির দাগ শুকিয়ে যায়নি।

বুলবুল তাকে বলল, 'সুখী হও, তুমি সুখী হও। লাল গোলাপ তুমি পাবে। আমি জোছনা– রাতে গান গেয়ে আমার বুকের রক্তে সেই গোলাপ ফোটাব। এর বদলে তোমার কাছ থেকে আমি কেবল এ–ই চাই যে, তুমি যথার্থ প্রেমিক হবে, কেননা দর্শনের চেয়ে ভালোবাসা বেশি জ্ঞানী, আর দক্ষতার চেয়েও ভালোবাসা অনেক বেশি শক্তিশালী। ভালোবাসার সারাশরীর যেন আগুনের রঙ, তার দুটি ডানাও অগ্নিবর্ণ, তার ঠোঁট মধুর মতো মিষ্টি আর তার নিশ্বাস তো ধূপের সুরভি।'

ছাত্রটি ঘাসের উপর থেকে মাথা তুলে উপরের দিকে তাকাল এবং চুপ করে শুনল, কিন্তু সে বুঝতেই পারল না বুলবুল কী বলছে। কেননা, ছেলেটি তার বইপত্রে যা লেখা আছে তার বাইরে আর কিছুই বুঝত না।

কিন্তু ওকগাছ সব বুঝল, তার মন খারাপ হয়ে গেল। বুলবুলকে খুব ভালোবাসত সে! বুলবুল তার ডালে বাসা বেঁধে ছিল বলে।

সে ফিসফিস করে বলল, 'ভাই, আমাকে তোমার শেষ গানটি শোনাও। তুমি চলে গেলে আমার বড় একা–একা লাগবে।'

বুলবুল ওকগাছকে গান শোনাতে লাগল। তার গলা যেন রুপোলি পাত্রে জলবুদ্বুদের শব্দের মতো।

গান যখন শেষ হয়েছে তখন ছাত্রটি উঠে দাঁড়াল, পকেট থেকে একটা নোটবই আর পেন্সিল বের করল।

'মেয়েটির গড়ন বড় সুন্দর—এটা না–মেনে উপায় নেই, কিন্তু কোনো অনুভূতি কি তার আছে?' নিজের মনে বলতে লাগল ছাত্রটি, 'আমি কিছু পরোয়া করি না। আসলে মেয়েটি শিল্পীদের মতো : তার কেবল ভঙ্গিই আছে, ঐকান্তিকতা নেই। সে অপরের জন্যে কখনো নিজেকে উৎসর্গ করবে না। সে কেবল গান–বাজনা সম্পর্কেই ভাবে, আর কে না জানে—সমস্ত শিল্পই বড় স্বার্থপর। তবু, এ–কথা মানতেই হবে যে মেয়েটির গলায় খুব সুন্দর সুরের কাজ আছে। কিন্তু হায়রে, তার এ–সব গুণের তো কোনো মানেই হয় না, কোনো লোকের এতটুকু উপকারও তা দিয়ে কখনো হবে না।' তারপর ছেলেটি তার ঘরে ফিরল, মাদুর পাতা বিছানার উপর শুয়ে–শুয়ে তার ভালোবাসার কথা ভাবতে লাগল। আরো কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

সেদিন রাত্রে সারা আকাশ চাঁদের আলোয় ভরে গেছে। স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতায় চাঁদ আকাশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। বুলবুল ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে গেল গোলাপগাছের কাছে, একটা কাঁটার উপরে বুক পেতে রেখে সে বসে রইল তার ডালে। কাঁটায় বুক রেখে সারারাত ধরে সে গান গাইল, স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ চাঁদ সে–গান শুনতে ঝুঁকে পড়ল মাটির দিকে, চাঁদ গান শুনতে লাগল। সারারাত গান গাইল বুলবুল, আর গোলাপের কাঁটা একটু–একটু করে তার বুকের ভিতরে বিঁধে যেতে লাগল। তার দেহের সমস্ত রক্ত গোলাপগাছের দেহে চলে যাচ্ছিল।

প্রথমে সে গাইল একটি বালক ও একটি বালিকার হৃদয়ের ভালোবাসার কথা। আর তখনই গোলাপগাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে একটি অপূর্ব গোলাপ ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগল। গানের পর গান বুলবুল গেয়ে যাচ্ছে আর একটির পর একটি পাপড়ি চোখ মেলছে। প্রথমে তার রঙ বড় ফ্যাকাশে, নদীর উপরে কুয়াশা যেমন ঝুলে থাকে তেমনি তার রঙ, সকালবেলার

পায়ের মতো বিবর্ণ, ভোরবেলাকার ডানার মতো রুপোলি। রুপোর আয়নায় গোলাপের যেমন ছায়া পড়ে, পুকুরের জলে যেমন গোলাপের ছায়া ভাসে, ঠিক তেমনি এ গোলাপটি ধীরে ধীরে সবচেয়ে উপরের ডালটিতে ফুটে উঠতে লাগল।

কিন্তু গাছটি বুলবুলকে আরো জোরে কাঁটার উপর তার বুক চেপে ধরতে বলল। 'ছোট্ট বুলবুলি, আরো জোরে চেপে ধরো', গোলাপগাছ তাকে বলে উঠল, 'না হলে গোলাপে রঙ ধরবার আগেই-যে সকাল হয়ে যাবে!'

বুলবুল কাঁটার উপরে তার বুক আরো জোরে চেপে ধরল, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর। সে তখন একটি ছেলে আর একটি মেয়ের হৃদয়ে প্রেমের জন্মের গান গাইছিল।

আর তখনই গোলাপের পাপড়িতে হালকা লালচে আভার ছোঁয়াচ লাগল, ঠিক যেন লজ্জারাঙা নববধূর মুখ। গোলাপের কাঁটা কিন্তু তখনো বুলবুলের কল্‌জেতে গিয়ে ঠেকেনি, তাই গোলাপের বুক তখনো সাদা হয়ে আছে। বুলবুলের বুকের রক্তই একমাত্র গোলাপের বুক রাঙাতে পারে।

গোলাপগাছ আবার আরো জোরে কাঁটার উপর তার বুক চেপে ধরতে বলল। বুলবুলকে বলল সে, 'ছোট্ট বুলবুলি, আরো জোরে চেপে ধরো, না হলে গোলাপে রঙ ধরবার আগেই সকাল হয়ে যাবে যে।'

বুলবুল তাই কাঁটার উপরে তার বুক আরো জোরে চেপে ধরল, আর অমনি কাঁটা হৃৎপিণ্ডে গিয়ে ঠেকল। একটা ভয়ানক যন্ত্রণা সারাশরীরে ছড়িয়ে গেল তার। যন্ত্রণা ক্রমশ একটু-একটু করে বাড়তে থাকে আর তা তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়। সে তখন ভালোবাসার গান গাইছিল যে-ভালোবাসা মৃত্যুতে পূর্ণতা পায়, মৃত্যুর পরেও যে-ভালোবাসা মরে না।

অপরূপ গোলাপ তখন লাল টুকটুকে হয়ে উঠেছে, সূর্যোদয়ের আকাশের মতো রাঙা তার রঙ। তার সমস্ত পাপড়ি লাল হয়ে গেছে, আর তার হৃদয় চুনির মতো রাঙা।

কিন্তু বুলবুলের কণ্ঠ ক্রমশই ক্ষীণ হতে লাগল, তার ছোট-ছোট দুটি ডানা কয়েকবার ঝাপটাল সে, চোখের উপর তার পর্দার মতো কী যেন নেমে এল। তার গান মৃদুতর হয়ে আসছে, গলা যেন কে টিপে ধরেছে তার।

তখন শেষবারের মতো সে আরেকবার সুর তুলল। রুপোলি সাদা চাঁদ সে গান শুনে ভোরের কথা ভুলে গেল, আকাশের বুকে থমকে দাঁড়াল। লাল গোলাপ এই গান শুনল। তার সারাদেহ শিহরিত হল আনন্দে, সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে সে তার পাপড়ি মেলে ধরল। তার গানের প্রতিধ্বনি পাহাড়ের গুহায় ছড়িয়ে পড়ল কেঁপে-কেঁপে, রাখালছেলেদের ঘুম ভেঙে গেল। নদীর বুকে কাঁপন তুলে ভেসে-ভেসে তার স্বর চলে গেল সাগরের দিকে।

গোলাপগাছ বলে উঠল, 'দ্যাখো, দ্যাখো, ফুল ফোটা শেষ হয়েছে।' কিন্তু বুলবুল কোনো জবাব দিল না সে-কথার। ঘাসের উপরে সে তখন মৃত পড়ে আছে, তার বুকের মধ্যে কাঁটা বেঁধা।

বেলা হলে ছাত্রটি ঘুম থেকে উঠল। জানালা খুলে তাকাল বাইরের দিকে। তারপরেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ইস্, আমার কী ভাগ্য! একটা গোলাপ ফুটেছে। আমি সারা-জীবন এমন একটিও গোলাপ দেখিনি। কী সুন্দর ফুল; আমার নিশ্চিত ধারণা—এর একটা বিরাট লাতিন নাম আছে।' সে হাত বাড়িয়ে জানালার বাইরে থেকে ফুলটি তুলে নিল। তারপর মাথায় টুপি চাপিয়ে হাতে গোলাপফুল নিয়ে একদৌড়ে তার অধ্যাপকের বাড়ি পৌঁছুল।

অধ্যাপকের মেয়ে তখন দরজার কাছে বসে একটা গুলিতে নীলরঙের রেশমি সুতো গোটাচ্ছে আর তার পায়ের কাছে শুয়ে আছে ছোট্ট একটি কুকুর।

ছেলেটি তাকে দেখেই বলে উঠল, 'তুমি বলেছিলে একটি গোলাপ দিলে আমার সঙ্গে নাচবে। এই দ্যাখো, পৃথিবীর সেরা গোলাপ তোমার জন্যে নিয়ে এসেছি। আজ রাত্রে বুকের ওপরে তুমি এটা পরে যখন আমার সাথে নাচবে তখন বুঝতে পারবে আমি কী রকম তোমাকে ভালোবাসি।'

মেয়েটির ভ্রু কিন্তু কুঁচকে উঠল।

সে উত্তর দিল, 'কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আমার পোশাকের সঙ্গে এটা খাপ খাবে না। আর তা ছাড়া, চেম্বার্লেনের[৪] ভাইপো আমাকে কয়েকটা খাঁটি মণিমুক্তো পাঠিয়েছে। ফুলের চেয়ে মণিমুক্তোর দাম যে কত বেশি সবাই তা জানে।'

'তুমি একটা আস্ত বেঈমান', ছাত্রটি তখন রেগে চেঁচিয়ে ওঠে। গোলাপফুলটি রাস্তার উপরে ছুড়ে ফেলে দিল সে, আর তারপরেই একটা গাড়ির চাকা তার উপর দিয়ে চলে গেল।

মেয়েটি বলে উঠল, 'তুমি একটা অকৃতজ্ঞ। বড় অভদ্র তুমি। আর তুমি এমন কে এসে গেছ, শুনি? মোটে তো একজন ছাত্তর! আমার তো মনে হয়—চেম্বার্লেনের ভাইপোর জুতোয় রুপোর যে-আংটা আছে, তা-ও তোমার নেই।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি, তারপর ঘরের ভিতরে চলে গেল।

ছাত্রটি ফিরে এল এরপর। 'ভালোবাসা ব্যাপারটা কী বোকামি!' পথ চলতে-চলতে বলতে লাগল সে, 'যুক্তিবিদ্যার অর্ধেক উপকারও এ করতে পারে না, কেননা কিছুই প্রমাণ করা যায় না এ দিয়ে; তা ছাড়া যে-সব ব্যাপার কখনো ঘটবে না ভালোবাসা কেবল সেইসব কথা বলে, যা তোমার বিশ্বাস করার কথা নয় ভালোবাসা তাই তোমাকে বিশ্বাস করাবে। আসলে, ভালোবাসা বিন্দুমাত্র কোনো কাজে লাগে না, আর আজকাল যে-কোনো জিনিসের উপযোগিতাই হল সব। দর্শনশাস্ত্র আর অধিবিদ্যাই বরং এখন থেকে চর্চা করব।'

অতঃপর ছাত্রটি তার নিজের ঘরে ফিরে এল। ঘরে ফিরে সে একটা ধুলোভর্তি বিরাট বই টেনে বের করে পড়তে শুরু করে দিল।

---

১. সূর্য-ঘড়ি : সূর্যরশ্মির প্রতিফলনের ছায়া দ্বারা সময় পরিমাপক যন্ত্র।

২. মৎস্যকন্যা : এর মুখমণ্ডলসহ ঊর্ধ্বাঙ্গ রমণীর, নিম্নাংশ মৎস্যের।

৩. ড্যাফোডিল : উত্তর ইউরোপের বনে-বাদাড়ে ফুটে থাকা হলুদরঙের ফুল।

৪. চেম্বার্লেন : ইংলান্ডের রাজপরিবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

সুখী যুবরাজ

শহরের মধ্যে একজায়গায় খুব উঁচু এক স্তম্ভের উপরে সুখী যুবরাজের স্বর্ণমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, সারা শহরের দালানকোঠা ছাড়িয়ে আরো অনেক উঁচুতে। তার সারাশরীর পাতলা সোনার পাত দিয়ে মোড়া। তার দুই চোখ উজ্জ্বল দুটি নীলকান্তমণির আর তরবারির হাতলে তার একটা বড় টকটকে লাল চুনি ঝকঝক করছে।

সত্যি, যে দেখত সেই এই সুখী রাজকুমারের প্রশংসা করত। পৌরসভার একজন সদস্য তো শিল্পরুচি জানান দিতে গিয়ে বললেন একদিন, 'বায়ুনিশান যে-রকম, ঠিক সে-রকম সুন্দর ওটি।' তারপর যোগ করলেন, 'দোষের মধ্যে কেবল এই—ওটা তেমন দরকারি নয়, এই যা।' তাঁর ভয় ছিল পাছে লোকে তাঁকে একজন বাস্তববুদ্ধিহীন (যা তিনি আদৌ নন) ভেবে বসে।

'তুমি সুখী যুবরাজের মতো হতে পারো না?' বুদ্ধিমতী এক জননী তাঁর শিশুকে বলে উঠলেন। শিশুটি চাঁদ-মামাকে ধরবে বলে বায়না ধরেছিল, কান্নাকাটি করছিল। 'সুখী রাজপুত্তুর তো কই কোনোকিছুর জন্যে কাঁদে না।'

বড় দুঃখী লোক সে, বড় হতাশ। যেতে-যেতে একবার অপূর্ব স্বর্ণমূর্তির দিকে চেয়ে নিজের মনেই বলে উঠল : 'আমার খুব ভালো লাগছে, পৃথিবীতে অন্তত এই একজন আছে যে সুখী।'

'সে যেন অবিকল কোনো দেবদূত'—ঝলমল লাল পোশাক আর সাদা পিনাফোর-পরা অনাথ ছেলেমেয়েগুলো গির্জা থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে এ-কথাগুলো বলল।

'কেমন করে তোমরা জানলে?' অঙ্কের মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করে উঠলেন, 'তোমরা তো কখনো কোনো দেবদূত দেখনি।'

'তাই তো! কিন্তু আমরা যে স্বপ্নে দেখেছি', ছেলেমেয়েরা উত্তর দিল; আর সেই অঙ্কের মাস্টার ভ্রূকুটি করে গম্ভীর হয়ে গেলেন, তাঁকে বড় ভীষণ দেখাচ্ছিল,—কেননা, ছেলেমেয়েরা স্বপ্ন দেখুক তা তিনি চাইতেন না।

এক রাত্রে শহরের উপর দিয়ে একটি পাখি উড়ে যাচ্ছিল। ছ-সপ্তাহ হল তার বন্ধুরা মিশরে উড়ে চলে গেছে। সে থেকে গিয়েছিল, কেননা খুব সুন্দরী এক পানকৌড়ির সঙ্গে ভাব হয়েছিল তার। শরৎকালে একদিন সে যখন একটা প্রজাপতির পিছনে তাকে ধরবে বলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন পানকৌড়ির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। পানকৌড়ির পরনে এত সুন্দর এক ঘাঘরা ছিল যে সে হা করে তাকিয়ে থাকল বহুক্ষণ, তার সাথে কথা বলতে পর্যন্ত ভুলে গেল।

অবশেষে চাতক পাখি বলেই ফেলল পানকৌড়িকে, 'তোমাকে কি ভালোবাসব আমি?' সে যেন তক্ষুনি এর একটা হেস্তনেস্ত করতে চাইছিল; আর তার ঐ কথাতে পানকৌড়ি ছোট্ট করে একটু ঘাড় নাড়ল। তখন সে তার চারদিকে ঘুরে-ঘুরে উড়ে বেড়াতে লাগল, বারে বারে ডানা দিয়ে পানি ছুঁয়ে রুপোলি ঢেউ তুলতে লাগল নদীর বুকে। এভাবেই সারা শরৎকাল ধরে সে পানকৌড়িকে তার ভালোবাসা জানাল।

আরো যে-সব চাতক পাখি ছিল সেখানে, তারা বলাবলি করতে লাগল, 'কী রকম বুদ্ধুর কারবার দেখছ! পানকৌড়ি মেয়েটার তো পয়সাকড়ি কিছুই নেই, তার ওপর এর মেলা আত্মীয়-স্বজন।' আর আসলেই তাই। নদীটা পানকৌড়িতে ভরা ছিল। তারপর যখন হেমন্ত এসে গেল, ওরা সবাই চলে গেল।

পানকৌড়ির দল চলে গেলে তার খুব একা লাগল, যে-পানকৌড়িকে ভালোবাসত তার জন্য তার মন কেমন করতে লাগল। সে মনে-মনে বলল, 'মেয়েটা একদম গল্প করতে জানত না। তা ছাড়া, আমার মনে হয়, সে খুব দুষ্টু ছিল, কেবলি বাতাসের সঙ্গে ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াত সে।' আসলেও তাই, যখনই বেশ হাওয়া দিত, পানকৌড়ি তখনই খুব সেজেগুজে ভাব করে থাকত। চাতক নিজের মনে আবার বলল, 'অবশ্য সে খুব সংসারী মেয়ে ছিল; তবে কিনা, আমি তো ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসি, আমার বৌয়েরও উচিত ঘুরে-বেড়ানো পছন্দ করা।'

শেষপর্যন্ত সে পানকৌড়িকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি আমার সাথে চলে আসবে?' কিন্তু মাথা নেড়েছিল মেয়েটি; বাড়ির সকলকে এত ভালোবাসত সে!

সে তখন রেগেমেগে বলেছিল, 'তুমি ধোঁকাবাজি করছ আমার সঙ্গে। ভালো, আমিও পিরামিডের দেশে চলে যাচ্ছি। বিদায়!' তারপর উড়ে চলে এসেছিল সে।

২

সারাদিন সে উড়ে এসেছে, তারপর রাত্রে এসে পৌঁছেছে এই শহরে। 'কোথায় থাকি এখন।' সে ভাবল, 'শহরটায় নিশ্চয়ই থাকবার ব্যবস্থাদি আছে।'

আর ঠিক তারপরই দেখতে পেল বিরাট স্তম্ভের উপরে এই স্বর্ণমূর্তি। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'এখানেই থাকতে পারব। খুব সুন্দর জায়গা আর বড় নির্মল বাতাস।' তখন শূন্য আকাশ ছেড়ে নিচে নেমে এল সে, সুখী রাজপুত্রের দু-পায়ের মধ্যিখানের জায়গাটুকুতে এসে বসল।

'আজ আমার বেশ সোনালি শোবারঘর হয়েছে।'—চারপাশে তাকিয়ে সে মনে-মনে নিজেকেই শোনাল কথাটা, তারপর ঘুমোবার জন্যে তৈরি হল। কিন্তু দু-ডানার মধ্যে মুখ

গুঁজে যখন সে ঘুমোতে যাবে, ঠিক তখনি পানির একটা ফোঁটা তার উপর পড়ল। 'কী অদ্ভুত ব্যাপার' সে চেঁচিয়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে, 'আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই, 'তারাগুলো কী সুন্দর উজ্জ্বল ঝকঝক করছে অথচ বৃষ্টিও হচ্ছে! এখানকার আবহাওয়া আসলে বড়ই বাজে। পানকৌড়ি বৃষ্টি খুব ভালোবাসত, কিন্তু সে তো কেবল তার স্বার্থপরতা।'

এমন সময় আবার একটি ফোঁটা পড়ল।

'বৃষ্টিই যদি আটকাতে না-পারল, তবে মূর্তিটা রাখা কেন?' সে বলতে লাগল, 'নাহ্, আমাকে একটা চিমনির ঘুলঘুলি খুঁজে বের করতেই হয়।' উড়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হল সে।

কিন্তু ডানা মেলে আকাশে উড়বার পূর্বে তৃতীয়বার আর-একটি পানির ফোঁটা পড়ল তার গায়ে, তখন আরেকবার সে উপরে তাকাল, আর দেখতে পেল—হায়, হায়! এ কী দেখছে সে?

সুখী রাজপুত্রের চোখ পানিতে ভরে উঠেছে, তার সোনালি গাল ভিজে গেছে চোখের পানিতে। চারদিকে যেন জোছনার বান ডেকেছে; সেই জোছনার আলোয় তার মুখ এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে চাতক পাখি তার জন্যে মায়া অনুভব করল।

তারপর সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

'আমি সুখী যুবরাজ।'

'তাহলে কাঁদছ কেন তুমি?' চাতক প্রশ্ন করল রাজকুমারকে, 'তুমি আমাকে একেবারে ভিজিয়ে দিয়েছ।'

'যখন আমি বেঁচে ছিলাম, মানুষের মতো হৃদয় যখন আমার ছিল,' মূর্তিটি বলতে লাগল, 'তখন আমি জানতাম না কান্না কাকে বলে। কেননা, আমি থাকতাম নন্দনপ্রাসাদে, দুঃখ সেখানে প্রবেশ করতে পারত না। দিনের বেলা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বাগানে খেলা করতাম, সন্ধের সময় বিশাল জলসাঘরে আমরা নাচগান করতাম। চতুর্দিকে খুব-উঁচু পাঁচিল দিয়ে বাগানটি ঘেরা ছিল, কিন্তু কোনোদিন আমি ঐ প্রাচীরের বাইরে কী আছে তা জানতে চাইনি। আমার চারপাশে যে-সব জিনিস থাকত তা এত সুন্দর যে, আর কোনোদিকেই আমি তাকাতাম না। রাজ্যের সব অমাত্য, উজির-নাজির আমাকে 'সুখী রাজপুত্র' বলে ডাকতেন। আর আসলে তো আমি সুখীই ছিলাম, যদি খুশির মধ্যে থাকাটাকেই লোকে সুখী হওয়া বলে। এভাবেই সারাজীবন কাটল আমার, তারপর মরে গেলাম একদিন। এখন মৃত্যুর পরে আমাকে তারা এত উঁচুতে রেখেছে যে আমাদের এই শহরের যত কুশ্রিতা, যত দারিদ্র্য সব আমি দেখতে পাই। আমার হৃদয় যদিও সিসের তৈরি, তবু কাঁদা ছাড়া আর কিছুই আমার করার থাকে না।'

'সে কী? রাজপুত্তুর তাহলে কেবল সোনা দিয়ে তৈরি নয়!' চাতক মনে-মনে অবাক হল। কিন্তু এত ভালোমানুষ ছিল সে যে, ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হল তার।

'অ-নে-ক দূরে'—সোনার রাজপুত্তুর খুব সুরেলা কণ্ঠে বলতে লাগল, 'অনেক দূরে সরু একটি রাস্তার উপরে একটা ভাঙা জীর্ণ বাড়ি। বাড়িটার একটা জানালা খোলা রয়েছে, খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, এক মহিলা একটা টেবিলের সামনে বসে আছেন। তাঁর রোগাটে মুখে বহু দুঃখের ছাপ। তাঁর ফরসা হাত কর্কশ খসখসে হয়ে গেছে, সূঁচ ফোঁটার দাগ সব কটি আঙুলে। ভদ্রমহিলা দরজি। একটা সার্টিনের গাউনে চিকনের ফুল তুলছেন; এই গাউনটি রানির সবচেয়ে সুন্দরী দাসি আগামী নাচের আসরে পরবে। ঘরের এককোণে একটি বিছানায় তাঁর ছোট্ট ছেলে শুয়ে-শুয়ে অসুখে ভুগছে। জ্বরের মধ্যে সে বারবার কমলালেবু খেতে চাইছে। কিন্তু একমাত্র নদীর পানি ছাড়া আর কিছুই দিতে পারছে না তার মা, তাই সে কাঁদছে। চাতক ভাই, তুমি বড়

লক্ষ্মী, একবারটি ঐখানে যাবে? আমার তরবারির হাতলে যে চুনি আছে সেটা ঐ মহিলাকে দিয়ে আসবে? এই স্তম্ভের সঙ্গে আমার পা বেঁধে রাখা হয়েছে, তাই আমি তো যেতে পারব না।'

'কিন্তু আমি যে মিশর যাব বলে অপেক্ষা করছি'। চাতক বলল, 'নীলনদের উপরে আমার বন্ধুবান্ধবরা খেলে বেড়াচ্ছে, কত বড় বড় পদ্মের সঙ্গে তারা গল্পগুজব করছে। শিগ্‌গির তারা সেখানকার রাজার সমাধিসৌধের উপরে ঘুমুতে যাবে। নকশাকাটা কফিনের মধ্যে রাজা অবিকলভাবে শুয়ে আছেন। তাঁর পরনে হলুদ সিল্কের কাপড়, আর কত হাজারো রকমের সুগন্ধি তাঁকে মাখানো হয়েছে। তাঁর গলায় হালকা সবুজ মণিমুক্তো বসানো হার ঝুলছে, আর তাঁর হাত ঠিক যেন গাছের শুকনো পাতা।'

'লক্ষ্মী চাতক ভাই,' রাজকুমার বলতে লাগল, 'তুমি কি একটা রাত আমার জন্যে দেরি করে আমার বার্তাবহ হতে পারো না? ছেলেটার এত তেষ্টা পেয়েছে, আর তার মা কত যে দুঃখী!'

'আমার মনে হয়, ছেলেপুলে আমি পছন্দ করি না,' চাতক বলল। 'গত গ্রীষ্মে যখন আমি নদীর উপর ঘুরে বেড়াচ্ছি, তখন দুটো শয়তান ছেলে—তারা ওখানকার মিল-মালিকের ছেলে—আমাকে ঢিল মারতে লাগল। ঢিল অবশ্য একটাও আমার গায়ে লাগে নি; আমরা চাতকেরা খুব তাড়াতাড়ি উড়ে যেতে পারি, আর তা ছাড়া যে-বংশের সন্তান আমি তা ক্ষিপ্রগতির জন্যে অত্যন্ত বিখ্যাত। কিন্তু তবু, এটা তো পরিষ্কার একটা অসম্মান।'

কিন্তু রাজপুত্রকে বড় বেশি বিষণ্ন মনে হল। চাতকের খুব মন-খারাপ হয়ে গেল তার জন্যে। সে বলল, 'এখানে বড্ড শীত, তবু তোমার জন্যে একটা দিন থেকে যাব আমি; তোমার বার্তাবাহক হবার জন্যে।'

'অনেক, অনেক ধন্যবাদ, চাতক ভাই', রাজকুমার বলল।

তারপর চাতক সেই তরবারির হাতল থেকে বিরাট চুনি ঠোঁটে করে তুলে নিল, তারপর শহরের মস্ত বিরাট বাড়িগুলোর ছাদের উপর দিয়ে উড়ে-উড়ে চলল।

শাদা মার্বেলপাথরের খোদাই-করা দেবদূতদের মূর্তিগুলো যেখানে রয়েছে, সেই গির্জার গম্বুজগুলো অতিক্রম করে সে উড়ে গেল। রাজপ্রাসাদের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে সে নাচের কলধ্বনি শুনল! একটি সুন্দরী মেয়ে তার বন্ধুকে নিয়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। ছেলেটি তাকে বলছে, 'আকাশে তারাগুলো কী অদ্ভুত! ভালোবাসার শক্তি কী অপূর্ব!'

মেয়েটি বলছে, 'মনে হয়, আগামী বড় নাচের আসরের আগেই আমার পোশাক তৈরি হয়ে যাবে। আমি কাপড়ের উপরে সুন্দর-সুন্দর ফুল আঁকতে দিয়েছি, কিন্তু দরজিগুলো এত কুঁড়ে।'

চাতক নদীর উপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগল। সে দেখতে পেল, জাহাজের মাস্তুলের উপরে লণ্ঠনগুলো জ্বলছে। গেটোর[১] উপর দিয়ে যেতে গিয়ে দেখতে পেল, ইহুদিরা বিভিন্ন জিনিসের দরদাম করছে আর তামার দাঁড়িপাল্লায় টাকা ওজন করছে। অবশেষে সে সেই গরিবের কুঁড়েঘরের কাছে এসে পড়ল। ঘরের ভিতরে উঁকি দিল সে। ছেলেটি জ্বরের ঘোরে অস্বস্তিতে এপাশ-ওপাশ করছে। তার মা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সে একপায়ে লাফাতে লাফাতে ঘরের মধ্যে গেল, তারপর টেবিলের উপর ফেলে-রাখা অঙ্গুস্তানার[২] পাশে বিরাট চুনিটা রেখে দিল। তারপর ছেলেটার বিছানার চারপাশে উড়ে বেড়াল, ছেলেটার মাথায় তার ডানা দিয়ে বাতাস করল। 'আহ্, কী আরাম লাগছে!' জ্বরের ঘোরেই ছেলেটি বিড়বিড় করে ওঠে, 'নিশ্চয়ই আমি ভালো হয়ে উঠছি।' সঙ্গে সঙ্গে আবার সে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেল।

চাতক সুখী রাজপুত্রের কাছে ফিরে এসে একটা-একটা করে সব কথা শোনাল, সে যা-যা করেছে সব বলল। তারপর বলে উঠল, 'ভারি মজার ব্যাপার! যদিও খুব ঠাণ্ডা পড়েছে আজ, আমার কিন্তু এখন গরম লাগছে।'

রাজকুমার বলল, 'তুমি-যে একটা খুব ভালো কাজ করেছ, তাই।' এই কথা শুনে চাতক কী যেন চিন্তা করতে লাগল; তারপর অল্পক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়ল সে। কোনোকিছু চিন্তা করতে বসলেই তার ঘুম এসে পড়ে।

সকাল হতেই সে নদীতে বেড়াতে বেরিয়ে গেল এবং সেখানে স্নান করল। পুলের উপর দিয়ে যখন হাঁটছিলেন তখন এই কাণ্ড দেখে পক্ষিবিশারদ অধ্যাপক খুব অবাক হয়ে গেলেন, 'ভারি তাজ্জব ব্যাপার তো! শীতকালে চাতক পাখি!' তারপর স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে তিনি সুদীর্ঘ এক পত্র লিখলেন। সকলেই সেই চিঠির বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করতে লাগল। চিঠিটায় বহু লম্বাচওড়া কথা ছিল যা অনেকেই বুঝতে পারেনি।

'আজকেই আমি মিশর পাড়ি দেব', ফুর্তিতে নিজের মনেই বলতে লাগল সে; নতুন যাত্রার সম্ভাবনায় সে আনন্দে টগবগ করছিল। সারাদিন ধরে সমস্ত স্মৃতিসৌধ দেখে বেড়াল, একটা গির্জার চূড়ায় অনেকক্ষণ যাবৎ বসে থাকল। যেখানেই যাচ্ছিল সে, চড়ুই পাখিরা আনন্দে কিচমিচ করে তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল, এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, 'দেখছ, কী রকম অভিজাত অতিথি!' এসব দেখে-শুনে সময়টা বেশ ভালোই কাটছিল।

রাত্রে আকাশে চাঁদ উঠলে সে সুখী যুবরাজের কাছে ফিরে এল। 'তোমার কোনো কিছু পাঠাবার দরকার আছে মিশরে?' রাজকুমারকে জিজ্ঞেস করল চাতক, 'আমি এক্ষুনি চলে যাব।'

'চাতক, লক্ষ্মী চাতক ভাই, তুমি কি আর একটা রাত থাকতে পারো না?' রাজপুত্তুর অনুরোধ করল তাকে।

চাতক জবাব দিল, 'মিশরে আমার জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে যে! আগামীকাল আমার বন্ধুরা জলপ্রপাত দেখতে যাবে। জলহস্তী সেখানে বিরাট ঝোপের মধ্যে শুয়ে গড়াগড়ি দেয়, গ্র্যানাইট পাথরের বিশাল ঘরে মেমনন[৩] দেবতা বাস করেন। সারারাত তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা দেখেন, যখন ভোরের শুকতারা ওঠে তখন আনন্দে একবার চেঁচিয়ে ওঠেন, তার পরক্ষণেই আবার চুপ করে যান। দুপুরবেলা হলদে সিংহগুলো বন থেকে বেরিয়ে জলার ধারে পানি খেতে আসে। তাদের চোখগুলো ঘন সবুজ, আর তাদের গর্জন জলপ্রপাতের চেয়েও ভয়াল।'

'লক্ষ্মী চাতক ভাই,' আবার অনুরোধ করতে লাগল রাজকুমার, 'শোনো। শহর পেরিয়ে অনেক দূরে একটি বাড়ির চিলেকোঠায় একটি লোক বসে আছে, দেখতে পাচ্ছি। নানা কাগজপত্র-ছড়ানো টেবিলের ওপর সে ঝুঁকে রয়েছে; তার পাশে একটা গ্লাসে অপরাজিতার গুচ্ছ, এখন শুকিয়ে গেছে। ছেলেটার চুল লালচে আর কোঁকড়ানো, তার ঠোঁট ঠিক বেদানার মতো লাল, আর বড় বড় চোখদুটো কেমন স্বপ্নময়। থিয়েটারের পরিচালকের জন্যে একটা নাটক লিখে দিতে হবে আজ রাত্রেই কিন্তু এত শীত করছে তার যে সে লিখতে পারছে না। চুল্লির[৪] মধ্যে কোনো আগুন নেই; আর এত খিদে পেয়েছে—সে যেন অজ্ঞান হয়ে যাবে।'

'আমি না-হয় তোমার সঙ্গে আজ রাতটাও কাটাব', চাতক বলল। তার মনটা সত্যিই বড় ভালো। সে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি আর-একটা চুনি নিয়ে যাব?'

'হায়, ভাই! আমার যে আর একটাও চুনি নেই; কেবল সম্বল এই দুটো চোখ। দুষ্প্রাপ্য নীলকান্তমণি দিয়ে এগুলো তৈরি, ভারতবর্ষ থেকে একহাজার বছর আগে নিয়ে আসা

হয়েছিল এদের। এর মধ্যে একটা তুলে নাও তুমি; তাকে দিয়ে এসো। সে এটা স্যাকরার দোকানে বিক্রি করে ঘরে জ্বালাবার কাঠ কিনবে, তারপর তার নাটক শেষ করবে।'

এ–কথা শুনে চাতক হায় হায় করে উঠল, 'সোনার রাজপুত্তুর, এ–কাজ আমি করতে পারব না'; রাজকুমারের জন্যে দুঃখে চাতক কাঁদতে লাগল।

'লক্ষ্মী চাতক ভাই, তুমি বড় ভালো; লক্ষ্মী, যা বলছি করো', রাজপুত্র আবার বলল তাকে।

যুবরাজের বারবার অনুরোধ কী করে এড়াবে সে?

বাধ্য হয়ে তখন চাতক রাজকুমারের একটা চোখ উপড়ে নিল, তারপর উড়ে গেল সেই ছেলেটির চিলেছাদে। ঘরের ভিতরে ঢুকতে কোনোই কষ্ট হল না তার, কেননা ছাদে একটা ঘুলঘুলি ছিল। যদিও খুব ভয় করছিল তার, তবু এভাবেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল সে। ছেলেটি দু–হাতে মুখ ঢেকে বসে ছিল, তাই সে তার ডানার আওয়াজ শুনতে পেল না; অনেকক্ষণ পরে যখন সে মুখ তুলে তাকাল, দেখল—কী সুন্দর একটা নীলকান্তমণি শুকনো অপরাজিতাগুচ্ছের উপরে জ্বলজ্বল করছে।

ছেলেটি অবাক। আনন্দে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'লোকে তাহলে আমার কদর বুঝতে আরম্ভ করেছে। এটা নিশ্চয়ই কোনো গুণমুগ্ধ ভক্তের কাছ থেকে এসেছে। যাক, এখন আমি আমার নাটক শেষ করতে পারব।' ছেলেটিকে খুব সুখী মনে হতে লাগল।

পরের দিন চাতক বন্দরে বেড়াতে গেল। বিশাল এক জাহাজের মাস্তুলের উপর বসে থাকল সে। নাবিকরা বিরাট বড় সব সিন্দুক জাহাজের পেট থেকে দড়ি দিয়ে টেনে উপরে তুলছে। এক–একটা সিন্দুকে জোরে টান মারছে, আর চেঁচিয়ে উঠছে, 'হেঁইও হো, হেঁইও হো'। তাদের দিকে তাকিয়ে একবার জোরে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আমি মিশরে চলে যাচ্ছি', কিন্তু কেউ কান দিল না তার কথায়। অনেক পরে আকাশে চাঁদ উঠল, তখন আবার সে ফিরে এল সুখী রাজপুত্রের কাছে।

'আমি বিদায় নিতে এসেছি তোমার কাছে,' রাজপুত্তুরকে বলল সে।

'লক্ষ্মী চাতক ভাই, আর একটা রাত কি থাকতে পারো না তুমি?' রাজকুমার জিজ্ঞেস করল তাকে।

চাতক জবাব দিল, 'এখন শীতকাল। বরফ পড়তে আরম্ভ করবে শিগ্‌গিরই। মিশরে এখনো গরম, সবুজ তালবনের উপরে এখনো সূর্যের উষ্ণ আলো পড়ছে; কাদার মধ্যে কুমির শুয়ে আছে আর পিটপিট করে অলসভাবে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। আমার সঙ্গীরা সেখানে বালবেকের[৫] মন্দিরে বাসা বাঁধছে, হালকা গোলাপি আর শ্বেত পায়রার দল দেখছে তাদের, আর নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করছে। রাজপুত্তুর, আজ আমাকে চলে যেতে হবেই; তবে তোমার কথা আমি কক্ষনো ভুলব না। আর আগামী বসন্তে যে–দুটো মুক্তো তুমি দিয়েছ তার বদলে অন্য দুটো সুন্দর মুক্তো তোমাকে এনে দেব। চুনিটা একেবারে লাল গোলাপের চেয়েও টকটকে রঙের হবে, নীলকান্তমণিও সমুদ্রের চেয়েও নীল এনে দেব।'

কিন্তু রাজপুত্র আবার বলতে আরম্ভ করেছে। সে বলছে, 'ঐযে নিচে চৌরাস্তার উপরে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে দেশলাই বিক্রি করে। নর্দমার মধ্যে তার সমস্ত দেশলাই পড়ে গেছে, ভিজে সেগুলো একদম অকেজো হয়ে গেছে। সে যদি বাড়িতে পয়সাকড়ি কিছু না– নিয়ে যেতে পারে, তাহলে তার বাবা মারবে তাকে। সে–জন্যে কাঁদছে সে। মেয়েটার পায়ে

জুতো-মোজা কিছুই নেই, তার ছোট্ট মাথাটিও খালি। চাতক ভাই, আমার অন্য চোখটাও উপড়ে নাও তুমি, মেয়েটিকে দিয়ে এসো; তাহলে ওর বাবা আর মারবে না ওকে।'

'আমি আর-একটি রাত্রি তোমার সঙ্গে থাকব না-হয়', সব শুনে চাতক বলল, 'কিন্তু এ চোখটিও তুলে নিতে পারব না আমি; তাহলে একেবারেই-যে অন্ধ হয়ে যাবে তুমি!'

'লক্ষ্মী চাতক ভাই, যা বললাম করো', আবার অনুনয় করল তাকে রাজকুমার।

তখন রাজপুত্রের এ-চোখটিও তুলে নিল সে, তখুনি শোঁ করে উড়ে নিচে চলে গেল। এক ঝাপটায় মেয়েটার পাশ দিয়ে উড়ে এল সে, আর তখনি তার হাতের উপর ঐ নীলকান্তমণিটি টুপ করে ফেলে দিল। 'বাহ্, কী সুন্দর একটা কাচ', আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠে মেয়েটি হাসতে হাসতে একদৌড়ে ঘরে চলে গেল।

চাতক ফিরে এল রাজকুমারের কাছে। সে বলল, 'তুমি অন্ধ হয়ে গেছ রাজকুমার, আর কখনো তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না।'

'লক্ষ্মী চাতক ভাই, তা হয় না। তোমাকে মিশরে যেতেই হবে।'

'আমি তোমার কাছে সব সময় থাকব', চাতক এই কথা বলে রাজপুত্রের পায়ের উপর ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন। রাজকুমারের কাঁধের উপর সে বসে আছে; এই অদ্ভুত জায়গায় সে যা-কিছু দেখেছে সবই রাজকুমারকে শোনাতে লাগল। নীলনদের তীরে লাল আইবিস[৬] পাখিগুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, সোনালি-লাল মাছ ঠোঁটে করে খুঁটছে; দূরে মরুভূমির বুকে স্ফিংস[৭] দাঁড়িয়ে আছে, পৃথিবীর বয়সের সমান বয়স তার, এই মরুভূমির বুকে লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে যা-কিছু ঘটছে সব জানে সে; দূরে সওদাগরেরা তাদের উটের পাশে-পাশে হেঁটে যাচ্ছে, হাতে তারা স্ফটিকের তস্‌বি গুনে চলেছে; চাঁদের পাহাড়ের রাজা, আবলুস কাঠের মতো কালো তার গায়ের রঙ, বিরাট এক স্ফটিকের পাথরকে সে পুজো করে; বিশাল সবুজ একটা সাপ তালগাছের নিচে ঘুমিয়ে আছে আর বিশজন পুরোহিত মধু দিয়ে তৈরি পিঠে তাকে খাওয়াবার জন্য সদা নিযুক্ত; হ্রদের উপরে পাতার ভেলা ভাসিয়ে প্রজাপতির পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে পিগ্‌মির[৮] দল—এই সব, এই সমস্ত কিছু চাতক পাখি রাজকুমারকে একটার পর একটা বলে যাচ্ছিল।

'লক্ষ্মী ভাই চাতক', যুবরাজ বলতে লাগল, 'তুমি খুব অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার শোনালে, কিন্তু আসলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার চেয়ে আশ্চর্য আর কিছুই নেই। মানুষের দারিদ্র্যের চেয়ে পরমাশ্চর্য কিছু নেই আর। লক্ষ্মী ভাই, তুমি একবার আমার এ-শহরটার উপর একটু ঘুরে এসে আমাকে কী কী দেখলে বলে যাও।'

চাতক শহরের উপর দিয়ে অতঃপর উড়ে চলল। সে দেখল, বড় লোকেরা তাদের বাড়িতে খুব আনন্দ করছে, আর তাদের দরজায় ভিক্ষুকের দল বসে আছে ভিক্ষার আশায়। অন্ধকার গলির মধ্য দিয়ে উড়ে গেল সে; দেখল, কচি কচি ছেলেমেয়েদের ক্ষুধাতুর মুখ উদাসীনভাবে অন্ধকার রাস্তায় চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একা পুলের নিচে খিলানের ভিতরে দুটি ছোট্ট ছেলে গলা জড়াজড়ি করে শুয়ে একে অন্যকে গরম করে রাখতে চেষ্টা করছে। 'ইস্, কী খিদে যে পেয়েছে আমাদের', বলে উঠল তারা। এমন সময় পাহারাদার এসে ধমক দিল তাদের, 'খবরদার, এখানে শোয়া চলবে না।' তখন ছেলে দুটি খিলানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে চলে গেল।

এই দেখে তৎক্ষণাৎ সে রাজকুমারের কাছে উড়ে গেল, তারপর একে একে সে যা-যা দেখেছে সব বলল।

'আমার দেহ খুব পাতলা সোনা দিয়ে মোড়া', চাতককে রাজপুত্র বলতে থাকে, 'তুমি আস্তে আস্তে পরতের পর পরত ঐ সোনা খুলে নিয়ে ঐ গরিবদের দিয়ে এসো; যারা বেঁচে আছে তারা সবসময় ভাবে যে, সোনা পেলেই তারা সুখী হবে।'

পরতের পর পরত সোনা খুলে নিতে লাগল চাতক রাজকুমারের দেহ থেকে, যতক্ষণ-না সুখী রাজপুত্রকে বিশ্রী আর ম্যাড়মেড়ে দেখাতে লাগল। একটির পর একটি সোনার পাত চাতক দরিদ্রদের দিয়ে আসতে লাগল; তাদের ছেলেমেয়েদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তারা হাসিখুশি মনে রাস্তার উপরে খেলা করে বেড়াতে লাগল। তারা বলতে লাগল, 'এখন আমরা খেতে পেয়েছি।'

৩

তারপরে একদিন বরফ পড়তে লাগল, তারপর এল তুষারঝড়। তুষারভরা রাস্তাগুলো মনে হল যেন রুপোর তৈরী—কী উজ্জ্বল চকচকে। ঘরের চাল থেকে স্ফটিক-স্বচ্ছ বরফের ঝুরি ঝুলছে। রাস্তায় যারা বেরিয়েছে, সকলের গায়ে পশুচর্মের তৈরি ফার-কোট। মাথায় লাল টুপি দিয়ে বাচ্চাছেলেরা বরফের উপর স্কেট পরে বেড়াচ্ছে।

বেচারা চাতকের ক্রমশই বেশি ঠাণ্ডা লাগতে লাগল, কিন্তু তবু সে রাজকুমারকে ছেড়ে গেল না, সে তাকে খুব ভালোবেসেছিল। রুটির দোকানে গিয়ে যখন দোকানি অন্যমনস্ক সে-সময় দরজার এদিক-ওদিক থেকে রুটির টুকরো খুঁটে-খুঁটে খেত সে, আর ডানা ঝাপটে নিজের শরীরকে গরম রাখার চেষ্টা করত।

একদিন কিন্তু সে বুঝতে পারল যে, সে আর বাঁচবে না, সে মরে যাচ্ছে। এখন শরীরে যেটুকু শক্তি আছে, তাতে কেবল রাজপুত্রের কাছে উড়ে গিয়ে তার কাঁধে বসতে পারবে সে। রাজকুমারের নিকট গিয়ে সে অস্ফুট কণ্ঠে তাকে বলল, 'রাজপুত্তুর বিদায়! তুমি কি তোমার হাতে আমাকে একটিবার চুমো খেতে দেবে?'

রাজপুত্র খুশি হয়ে বলে উঠল, 'লক্ষ্মী চাতক ভাই, তুমি-যে শেষপর্যন্ত মিশরে যাচ্ছ এতে খুব ভালো লাগছে আমার। তুমি অনেকদিন নষ্ট করলে আমার কাছে থেকে। আমি তোমাকে ভালোবাসি। হাতে কেন, তুমি আমার ঠোঁটে চুমু খাও।'

চাতক বলল, 'মিশরে তো যাচ্ছি না আমি। আমি এখন মৃত্যুর প্রাসাদে যাচ্ছি। মৃত্যুই তো নিদ্রার ভাই হয়, নয় কি?'

তারপর সে সুখী রাজপুত্রের ঠোঁটে চুমু খেল, তারপর তার পায়ের কাছে পড়ে গেল—ততক্ষণে সে মৃত।

আর ঠিক সেইমুহূর্তে মূর্তিটির ভিতরে অদ্ভুত একরকমের আওয়াজ হল, যেন কোনো কিছু ভেঙে গেল তার মধ্যে। আসলে সিসের তৈরি মূর্তির হৃৎপিণ্ড তখন দু-টুকরো হয়ে গেছে। কী ঠাণ্ডাই-না পড়েছে সেদিন!

পরদিন সকালে নগরাধ্যক্ষ পৌরসভার সদস্যদের নিয়ে সদলবলে চৌরাস্তার ওখানে হাঁটছিলেন। রাজকুমারের স্মৃতিস্তম্ভের কাছে যেতেই মূর্তিটির ওপরে তাঁর চোখ পড়ল; 'সর্বনাশ! সুখী রাজপুত্রকে কী নোংরা লাগছে!' তিনি বলে উঠলেন।

পৌরসমিতির সভ্যরাও চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তাই তো, কী নোংরা!' তাঁরা সব সময়েই নগরাধ্যক্ষের কথার সঙ্গে একমত হতেন। তাঁরা সকলে মূর্তিটিকে ভালো করে পরীক্ষা করবার জন্যে তার কাছে গেলেন।

'তরবারির হাতল থেকে চুনিটা পড়ে গেছে, চোখদুটো নেই, গায়ের রঙও আর সোনালি নেই', নগরাধ্যক্ষ মন্তব্য করলেন, 'সত্যি বলতে কি একেবারে ভিখিরির মতো দেখাচ্ছে।'

'একেবারে ভিখিরির মতো দেখাচ্ছে,' সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথাটা প্রতিধ্বনি করলেন সাঙ্গপাঙ্গরা।

নগরাধ্যক্ষ আবার বলতে লাগলেন, 'আরে, একটা পাখি যে তার পায়ের কাছে মরে পড়ে আছে দেখছি!' একটু থেমে ফের বললেন, 'আমাদের অবশ্য ঘোষণা করে দিতে হবে যে, পাখিদের এখানে এসে মরা চলবে না।' একজন কেরানি তৎক্ষণাৎ তাঁর এই নির্দেশ টুকে নিল।

এরপর সুখী রাজপুত্রের মূর্তি সেখান থেকে টেনে নামানো হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলার অধ্যাপক বললেন, 'দেখতে যখন সে আর সুন্দর নয়, তার প্রয়োজনও আর নেই।'

অতঃপর বিরাট গনগনে চুল্লির আগুনে মূর্তিটিকে গালিয়ে ফেলা হল। অতখানি গালানো সিসে দিয়ে কী করা যেতে পারে তা ঠিক করার জন্যে নগরাধ্যক্ষ পৌরসভার এক অধিবেশন আহ্বান করলেন। সেখানে বললেন তিনি, 'আমাদের নিশ্চয়ই আর-একটি মূর্তি তৈরি করতে হবে, নয় কি? আর এ-মূর্তিটা আমারই হোক।'

তখন সভার সদস্যদের মধ্যে এ বলতে লাগল, 'আমার হোক', ও বলতে লাগল, 'না, আমার হোক।' এইভাবে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে ঝগড়া করতে লাগল। তাদের সম্পর্কে সর্বশেষ যা শুনেছি তা এই যে, তারা এখনো সমানে ঝগড়া করছে।

ধাতু গালাবার কারখানায় যেখানে রাজপুত্রের মূর্তি গালানো হয়েছে, সেখানে মজুরদের তদারককারী লোকটি একটা ব্যাপারে খুব অবাক হয়ে গেল। 'কী অদ্ভুত কাণ্ড!' বলে উঠল সে, 'রাজপুত্তুরের সিসের তৈরি হৃৎপিণ্ড চুল্লির এত গনগনে আগুনেও তো গলে গেল না। যাক্ গে, বাইরে ফেলেই দিই এটাকে।' এই বলে তারা সুখী রাজপুত্রের হৃদয় দূরে, জমানো জঞ্জালের স্তূপে, টান মেরে ফেলে দিল। সেখানে চাতক পাখিটিও মৃত পড়ে ছিল।

স্বর্গে ঈশ্বর তার ফেরেশতাদের একজনকে ডেকে বললেন, 'ঐ শহরে গিয়ে ওখানকার মহামূল্য দুটো জিনিস আমাকে এনে দাও।' দেবদূত তাঁকে মৃত চাতক আর সিসের হৃদয় এনে দিল।

তখন তিনি বললেন, 'ঠিকই এনেছ তুমি। আমার স্বর্গের নন্দনকাননে এই ছোট্ট পাখি চিরকাল গান গাইবে, আর আমার স্বর্ণ-নগরে সুখী যুবরাজ গুণগান করবে আমার।'

---

১. গেটো (ghetto) : ইহুদি অধিবাসীদের বসবাসের জন্যে নির্ধারিত স্থান।

২. অঙ্গুস্তানা (thimble) : সেলাই-কাজে ব্যবহারের জন্যে লোহার তৈরি একধরনের আঙুলের টুপি।

৩. মেমনন (Memnon) : গ্রিক পুরাণের একটি চরিত্র।

৪. চুল্লি : উনুন বা চুলো নয়। ভীষণ শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে দেয়ালে তাক কেটে কাঠ জ্বালানোর ব্যবস্থাকে এখানে চুল্লি বলা হয়েছে, যাকে ইংরেজিতে ফায়ার-প্লেস বলে।

৫. বালবেক (Balbeck) : মিশরের নীল অববাহিকায় একটি প্রাচীন শহর।

৬. আইবিস (Ibis) : বকের মতো একধরনের পাখি। ঠোঁট পাতলা এবং নিচের দিকে ঈষৎ বাঁকানো। ঘাড় ও মাথা কৃষ্ণবর্ণের, পালক সাদা।

৭. স্ফিংস (Sphinx) : মিশরের গির্জাতে অবস্থিত একটি বিশাল আকার প্রস্তরমূর্তি। মূর্তিটি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৫৫০ অব্দে তৈরি করা হয়।

৮. পিগ্‌মি (Pygmy) : এরা অসম্ভব বেঁটে হয়। হোমারের সময় থেকেই এই বামন-মানুষের কথা শোনা যায়। মিশরের নীলনদের তীরবর্তী কোনো অঞ্চলে এদের বসবাস ছিল বলে মনে করা হত।

৯. স্কেট (Skate) : বরফের উপর দিয়ে জোরে হেঁটে বা দৌড়োনোর জন্যে মসৃণ ইস্পাতের পাত জুতোর তলায় লাগিয়ে নেয়া হয়। এই ইস্পাতের পাতকে স্কেট বলে।

তারা থেকে ঝরা

মস্ত পাইন-বনের ভিতর দিয়ে দুজন গরিব কাঠুরে বাড়ির দিকে চলেছে। শীতকাল; কনকনে ঠাণ্ডা রাত্তির। মাটির উপর, গাছের ডালে ঘন হয়ে বরফ পড়ছে, বরফের চাপে ছোট-ছোট শুকনো ডাল পথের দু-ধারে ভেঙে-ভেঙে পড়ছে, আর তারই ভিতর দিয়ে দুজনে চলেছে। চলতে-চলতে গিরি-নদীর কাছে এসে তারা দেখল, গিরি-নদী আর চলেও না, বলেও না, তুষার-রাজার চুমোয় সে একেবারে চুপ।

সেবারে এতই শীত যে বনের পশু-পাখিরও আর সহ্য হয় না। দু-পায়ের ফাঁকে ল্যাজটি গুটিয়ে নিয়ে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে নেকড়ে বাঘ বললে, 'উহ্! কী বিকট শীত! গভর্মেন্টকেও বলিহারি! এর কোনো ব্যবস্থাই করছে না!'

'কিচ্-কিচ্! কিচ্-কিচ্! কিচ্-কিচ্!' একঝাঁক ছোট্ট ফিঙে বলে উঠল—'বুড়ি পৃথিবী মরে গেছে, শাদা কাপড় দিয়ে তাকে ঢেকে দিলে।'

একজোড়া পায়রা, এ ওর কানে চুপি-চুপি বললে, 'পৃথিবীর বিয়ে হবে, এই তার বধূবেশ!' তাদের ছোট্ট লালচে পাগুলো বরফে একেবারে খেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এই ঠাণ্ডারও বেশ একটা কবিত্বময় ব্যাখ্যা না-করলে তাদের মান থাকে না।

'যত সব বাজে কথা!' নেকড়ে বাঘ ঘোঁৎ করে উঠল। 'আমি বলছি এ-সবই গভর্মেন্টের গাফিলি। আমার কথা যদি বিশ্বাস না করো তাহলে তোমাদের খেয়েই ফেলব।' বনের মধ্যে নেকড়ে ভারি কাজের লোক—তার মুখে যুক্তির অভাবও কখনো হয় না। কাঠঠোকরা হলেন জাত-দার্শনিক, তিনি বললেন, 'হেতু কি নিমিত্ত নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। যা আছে, তা আছেই; আর এখন যে ভীষণ শীত তা তো দেখাই যাচ্ছে।'

তারপর দুজনে বরফের উপর বসে-বসে কাপড়ের ভাঁজগুলি একে-একে খুলতে লাগল, সোনাটা দুজনে সমান ভাগ করে নেবে, এই তাদের মনের কথা। কিন্তু হায়রে! ওর ভিতরে না আছে সোনা, না আছে রুপো, না আছে মুণিমুক্তো—আছে শুধু ছোট্ট একটি ঘুমন্ত শিশু।

তখন একজন আর-একজনকে বললে : 'ভাই রে! আমাদের সব আশা চুরমার হল। ধনরত্ন কিছুই পেলাম না—এই বাচ্চাকে দিয়ে কী-বা লাভ হবে আমাদের! চল্ ওকে এখানে ফেলেই আমরা চলে যাই—আমরা গরিব, নিজেদের ছেলেপুলেদেরই পেট ভরে খাওয়াতে পারিনে—এর ওপর ওকে আবার খাওয়াব কী?'

আর-একজন জবাব দিলে : 'না, ওকে এখানে ফেলে গেলে ও নিশ্চয়ই শীতে জমে মরে যাবে—পাপের কথা মুখে এনো না। আমি তোমার মতোই গরিব, ভাঁড়ারে মা-ভবানী, অথচ পুষ্যি অনেকগুলো—তবু ওকে আমি বাড়ি নিয়ে যাব, আমার বৌ ওকে মানুষ করবে।'

ঐ কাপড়টি দিয়ে সে ভালো করে শিশুটিকে জড়াল যাতে ঠাণ্ডা না লাগে, তারপর সস্নেহে কোলে তুলে নিয়ে উৎরাইয়ের পথে নামতে লাগল গ্রামের দিকে। তার বোকামি দেখে, তার ভালোমানুষির বাড়াবাড়ি দেখে তার সঙ্গী তাজ্জব বনে গেল।

গ্রামের ভিতরে ঢুকে সঙ্গীটি বললে, 'তুমি তো বাচ্চাকেই নিচ্ছ, ঐ কাপড়টা আমাকে দাও। যা পেয়েছি তা দুজনে ভাগ করে নেওয়াই উচিত।'

'না, এ কাপড় আমারও নয়, তোমারও নয়, এই শিশুর,' বলে সঙ্গীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাঠুরে তার নিজের বাড়িতে এসে দরজায় টোকা দিলে।

দরজা খুলে দিয়ে কাঠুরে-বৌ যখন দেখলে যে কাঠুরে নিরাপদে বাড়ি ফিরেছে, তার আনন্দ ধরে না। স্বামীর কাঁধ থেকে কাঠের আঁটি নামিয়ে নিলে, জুতোয়-লাগা বরফের কুচি বুরুশ করে সাফ করে দিলে, তারপর তাকে ভিতরে আসতে বললে। কাঠুরে বললে, 'বৌ, আজ বনের মধ্যে একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি। তোমার জন্যেই সেটা নিয়ে এসেছি—তুমি তাকে যত্ন করবে তো?' বলে সে চৌকাঠের ধারেই দাঁড়িয়ে রইল। বৌ ব্যগ্রভাবে বললে, 'কী? কী? কৈ দেখি! আমাদের সংসারের যা হাল, কত জিনিসই তো আমাদের দরকার!'

তখন কাঠুরে কাপড়টি সরিয়ে ঘুমন্ত শিশুটিকে দেখালে।

বৌ বলে উঠল, 'আ আমার কপাল! আমাদের নিজেদের ছেলেপিলে কি কম যে তুমি আবার এক কুড়োনো ছেলে নিয়ে এসেছ! ছেলেটা হয়তো অলুক্ষণে, কে জানে! আর ওকে আমরা খাওয়াবই-বা কী, পরাবই-বা কী!'

বৌ রাগে গজগজ করতে লাগল!

'শোনো, ও সাধারণ ছেলে নয়, ও তারা থেকে ঝরা।' ওকে কুড়িয়ে পাবার আশ্চর্য ইতিহাস কাঠুরে বৌকে বললে।

কিন্তু তাতেও বৌ একটুও খুশি হল না, কাঠুরেকে বকুনি দিতে-দিতে খুব রাগ করে বললে, 'নিজের ছেলেদের খাওয়াতে পারিনে, আর-একজনের ছেলেকে খাওয়াব কোত্থেকে! এ-সংসারে কে কার কথা ভাবে! না-খেয়ে থাকলেও একমুঠো কেউ দেবে আমাদের?'

'ঈশ্বর আছেন, তিনি চড়ুই পাখির কথাও ভাবেন, তাদেরও খাওয়ান।'

'শীতকালে কি চড়ুই পাখিরা না-খেয়ে মরে না? এই তো এখনই শীতকাল—দেখতেও পাও না?'

কাঠুরে কোনো জবাব দিলে না, দোরগোড়া থেকে নড়ল না।

হঠাৎ বন থেকে ঠাণ্ডা হি-হি হাওয়া এসে খোলা দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল, কাঠুরে-বৌ কেঁপে উঠে বললে, 'দরজাটা বন্ধ করো না! ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে—আমি তো জমে গেলাম।'

'যে-বাড়িতে মানুষের হৃদয় পাষাণ, সে-বাড়িতে হাড়-কাঁপানো হাওয়া তো বইবেই।'

উত্তরে বৌ কিছু না-বলে আস্তে আস্তে আগুনের আরো কাছে সরে এল।

একটু পরে সে মুখ ফিরিয়ে কাঠুরের দিকে তাকাল, আর তার চোখ জলে ভরে এল। কাঠুরে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে এসে বাচ্চাকে বৌ'র কোলে তুলে দিল। কাঠুরে-বৌ তাকে চুমু খেয়ে ছোট্ট একটি বিছানায় শুইয়ে দিল—সেখানে তার নিজের সবচেয়ে ছোটটি ঘুমুচ্ছিল। পরের দিন সকালে কাঠুরে সেই আশ্চর্য সোনালি কাপড়টি সিন্দুকে ভরে রাখল আর কাঠুরে-বৌ দেখল বাচ্চার গলায় একটি অ্যাম্বরের মালা ঝুলছে। সেই মালাটিও খুলে নিয়ে সিন্দুকে তুলে রাখল কাঠুরে-বৌ। কাঠুরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তারা-ঝরা শিশুও বড় হতে লাগল। একসঙ্গে তারা খায়, শোয়, খেলা করে। আহা, কী রূপ তারা-ঝরার! প্রত্যেক বছরই সে আরো সুন্দর হচ্ছে, গাঁয়ের সব লোক তাকে দেখে হা হয়ে যায়। তারা সব কালো-কালো, চুল তাদের খাড়া-খাড়া; আর তার গায়ের রঙ চেরা-হাতির দাঁতের মতো শাদা আর কোমল, তার কোঁকড়া-কোঁকড়া সোনালি চুল যেন সূর্যমুখীর রেণু। লাল ফুলের পাপড়ির মতো তার ঠোঁট, স্বচ্ছ নদীর ধারে বেগনি রঙেরফুলের মতো তার চোখ, আর তার সমস্ত দেহটি যেন একটি ফুলের বাগান।

এত রূপ তার, কিন্তু এই রূপই তার কাল হল। যেমন সে দেমাগি, তেমনি স্বার্থপর, তেমনি নিষ্ঠুর। কাঠুরের ছেলেমেয়েদের সে গ্রাহ্যই করত না, গ্রামের কোনো ছেলেমেয়েকেই করত না—তাদের সে বলত ছোটেলোক ছোটঘরের সন্তান, আর সে নিজে সবচেয়ে উচ্চবংশের, তারা থেকে তার জন্ম! তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করত যেন সে প্রভু, আর তারা সব ভৃত্য। গরিবদের প্রতি একটুও দয়া ছিল না তার, কানা-খোড়া-ভিখিরির প্রতিও না। ঢিল ছুড়ে-ছুড়ে সে তাদের গ্রামের বার করে দিত—'যা, যা, এখান থেকে যা, এখানে মরতে আসিস কেন?' এ ছাড়া কথা ছিল না তার মুখে। ক্রমে এমন হল যে চোর-জোচ্চোর ছাড়া কেউ আর দু-বার সে গাঁয়ে ভিখ্ চাইতে আসে না। সে যেন রূপে মুগ্ধ হয়ে আছে, নিজের রূপেই মুগ্ধ; যারা দুর্বল, যারা দেখতে ভালো নয়, তাদের সে সবসময় টিটকিরি দিত, আর ভালোবাসত নিজেকে। গ্রীষ্মকালে যখন হাওয়া থাকত না, সে পুরুতঠাকুরের বাগানে কুয়োর ধারে শুয়ে-শুয়ে জলের মধ্যে নিজের মুখ দেখত—কী আশ্চর্য সেই মুখ—নিজের রূপ দেখে নিজেই আনন্দে হেসে উঠত সে।

কাঠুরে আর কাঠুরে-বৌ প্রায়ই তাকে ধমক দিয়ে বলত : 'যারা নিরাশ্রয়, যারা অসহায়, তাদের সঙ্গে তুমি যেমন ব্যবহার করো; আমরা তো তোমার সঙ্গে তেমন করিনি। দয়া না-পেলে যারা বাঁচে না, তাদের প্রতি এমন নিষ্ঠুর কেন তুমি?

বুড়ো পুরুতঠাকুর প্রায়ই তাকে ডেকে পাঠিয়ে জীবে দয়া শিক্ষা দিতে চেষ্টা করতেন। তিনি বলতেন, 'ঐ যে মাছিটা দেখছ, ও তোমার ভাই। তার অনিষ্ট করো না। বনের পাখি স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়ায়, নিজের সুখের জন্যে তাকে ধরবে বলে ফাঁদ পেত না। টিকটিকি, ছুঁচো, গুবরেপোকা সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি—তাদের সকলেরই জায়গা আছে পৃথিবীতে। ঈশ্বরের রাজ্যে দুঃখ আনবার তোমার তো অধিকার নেই। মাঠের গরু-ছাগলও তাঁরই জয়গান করে।'

কিন্তু তারা-ঝরা এ-সব কথা শুনেও শোনে না, ঠোঁট উল্‌টিয়ে মুখ ভার করে চলে যায়। যায় সে তার সঙ্গীদের কাছে, তাদের নিয়ে দল বাঁধে, তাদের ওপর অবাধ কর্তৃত্ব করে। সঙ্গীরাও তাকে মেনে চলে, কারণ সে দেখতে ভালো, পা দু-খানি তার হালকা, সে নাচতে পারে, বাঁশি বাজাতে পারে, গান গাইতে পারে। যেখানেই তারা-ঝরা তাদের নিয়ে যায়, সেখানেই যায় তারা; যা সে হুকুম করে, তা-ই তারা না-করে পারে না।

যেদিন সে বাঁশের ধারাল কঞ্চি দিয়ে একটি ছুঁচোর চোখ কানা করে দিলে, সেদিন তারা হি-হি করে হাসল, আর যেদিন সে কুষ্ঠরোগীর গায়ে ঢিল ছুড়ল সেদিনও তারা হেসে লুটিয়ে পড়ল। সব ব্যাপারেই সে তাদের ওপর রাজত্ব করে, তাই তাদেরও হৃদয় তারা-ঝরার মতোই পাষাণ হয়ে গেছে।

একদিন সেই গ্রামে এল এক গরিব ভিখারিনি। পরনের কাপড় তার ছেঁড়া, শক্ত পথে চলে-চলে তার পা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে, তার অবস্থা যে অতি হীন তা আর বলে দিতে হয় না। ক্লান্ত হয়ে সে একটা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে বসল।

তারা-ঝরা তাকে দেখে তার সঙ্গীদের ডেকে বলল, 'দ্যাখো! দ্যাখো! সবুজ পাতায় ভরা ঐ সুন্দর গাছটির তলায় কী জঘন্য একটা ভিখিরি বসেছে। ও এত কুচ্ছিত যে ওর দিকে তাকানো যায় না! এক্ষুনি ওকে তাড়িয়ে দিই, চল।' এই বলে সে কাছে এসে ভিখারিনিকে খ্যাপাতে-খ্যাপাতে তার গায়ে ঢিল ছুড়তে লাগল। বুড়ি তার দিকে তাকিয়ে রইল—তার মুখ থেকে চোখ নামাল না—সে-দৃষ্টি ভয়ে বিহ্বল। কাঠুরে একটু দূরে কাঠ কাটছিল, সে ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে ছুটে কাছে এসে ছেলেকে বকুনি দিয়ে বললে, 'এত নিষ্ঠুর তুমি! তোমার হৃদয় কি পাষাণ? দয়া-মায়া বলে তোমার প্রাণে কি কিছু নেই? এই বুড়ি ভিখিরি কী ক্ষতি তোমার করেছে যে তুমি তার সঙ্গে এ-রকম করছ!'

তারা-ঝরা রাগে লাল হয়ে মাটিতে পা ঠুকে বললে, 'আমি কী করি না-করি তা নিয়ে কথা বলবার তুমি কে? আমি তো তোমার ছেলে নই যে তোমার কথামতো চলব!'

কাঠুরে জবাব দিলে, 'সত্যি বলেছ! কিন্তু বনের মধ্যে তোমাকে যখন কুড়িয়ে পেয়েছিলাম তখন তোমাকে আমি দয়াই করেছিলাম।'

এ-কথা শোনামাত্র ভিখিরি বুড়ি চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল। কাঠুরে তাকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে এল, কাঠুরে-বৌ শুশ্রূষা করে তার মূর্ছা ভাঙাল, তারপর তার সামনে খাবার রেখে বললে, 'একটু ভালো বোধ করছ এখন?' বুড়ি কিন্তু জলস্পর্শ করল না। কাঠুরেকে বললে, 'তুমি' না বললে যে ঐ ছেলেকে বনে কুড়িয়ে পেয়েছিলে? ঠিক দশবছর আগে পেয়েছিলে কি?'

কাঠুরে বললে, 'হ্যাঁ, আজ থেকে ঠিক দশবছর আগে আমি ওকে বনের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।'

বুড়ি ব্যাকুলভাবে বলে উঠল, 'কী-কী চিহ্ন ছিল তার গায়ে, বলতে পারো? তার গলায় কি অ্যাম্বরের মালা ছিল? তার গায়ে কি জড়ানো ছিল তারার কাজ-করা সোনালি সুতোর কাপড়?'

'ঠিক তা-ই', বললে কাঠুরে। বলে সে সিন্দুক থেকে অ্যাম্বরের মালা আর সোনালি কাপড় বের করে এনে বুড়িকে দেখাল। বুড়ি আনন্দে কাঁদতে-কাঁদতে বললে, 'ও আমার ছেলে, ওকে আমি বনের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছিলাম। ওকে খুঁজে-খুঁজে সমস্ত পৃথিবী আমি ঘুরেছি—ওকে ডেকে পাঠাও, একটু দেখি ওকে।'

কাঠুরে আর তার বৌ দুজনেই বাড়ির বাইরে এসে তারা-ঝরাকে ডেকে বললে, 'বাড়ির ভিতরে যাও, সেখানে তোমার মা-কে দেখতে পাবে, তিনি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

কথাটা শুনে তারা-ঝরা যত অবাক হ'ল, খুশিও হল তত। লাফাতে-লাফাতে সে বাড়ির ভিতরে চলে গেল, কিন্তু গিয়ে যখন দেখল কে বসে আছে, বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে, 'কই, আমার মা কোথায়? এখানে তো ঐ কুচ্ছিত ভিখিরি-বুড়ি ছাড়া কাউকেই দেখছিনে।'

বুড়ি বললে, 'আমিই তোমার মা।'

'পাগল! পাগল!' তারা-ঝরা চটে উঠে বলল, 'ছেঁড়া কাপড়-পরা নোংরা ভিখিরি তুমি—আমি কক্‌খনো তোমার ছেলে নই। যাও তুমি এখান থেকে—তোমার ঐ বিচ্ছিরি মুখ আর যেন আমাকে না-দেখতে হয়।'

'না না, তুই আমারই ছেলে, তুই আমারই ছেলে—তোকে আমি বনের মধ্যে জন্ম দিয়েছিলাম!' বলতে-বলতে বুড়ি হাঁটু ভেঙে মেঝের উপর বসে পড়ে তারা-ঝরার দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিলে—'ডাকাতেরা তোকে চুরি করে নিয়ে ওখানেই মরণের মুখে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল—কিন্তু আমি তোকে দেখেই চিনতে পেরেছি, আর চিহ্নও সব মিলে গেছে—ঐ সোনালি কাপড় আর অ্যাম্বরের মালা! তুই আয়, আমার কাছে আয়, তোকে খুঁজে-খুঁজে সমস্ত পৃথিবী আমি ঘুরেছি—আয় আমার কাছে, তোকে না-পেলে আমি বাঁচব না।'

কিন্তু তারা-ঝরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বন্ধ করে দিল তার হৃদয়ের সব দরজা—বুড়ির বুক-ভাঙা কান্না ছাড়া ঘরের মধ্যে আর-কোনো শব্দ নেই।

অনেকক্ষণ পরে তারা-ঝরা যখন কথা বললে, তার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কঠোর শোনাল—'সত্যি যদি তুমি আমার মা হও, তাহলে তুমি এখানে না-এলেই ভালো করতে। কেন আমাকে এমন করে লজ্জা দিলে? আমি ভেবেছিলাম আমার মা আকাশের কোনো তারা—আর তুমি বলছ আমি একটা ভিখিরি-বুড়ির ছেলে! তুমি এখান থেকে চলে যাও—আর যেন তোমাকে আমি না-দেখি।'

বুড়ি কেঁদে বললে, 'বাছা, যাবার আগে তোকে একবার চুমু দিয়ে যাই, কাছে আয়। তোকে ফিরে পাবার জন্য কত কষ্ট আমি করেছি!'

তারা-ঝরা বললে, 'না, তুমি দেখতে বিকট! তোমার চুমুর চাইতে সাপের কি ব্যাঙের চুমুও ভালো।'

বুড়ি তখন উঠে দাঁড়াল, তারপর কাঁদতে-কাঁদতে বনে চলে গেল। তারা-ঝরা যখন দেখল যে বুড়ি চলে গেছে তার ফুর্তি আর ধরে না। এক-ছুটে সে সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল। কিন্তু সঙ্গীরা তাকে দেখে হি-হি করে হেসে উঠল।—'সে কী! তুই যে ব্যাঙের মতো কুচ্ছিত হয়ে গেছিস, সাপের মতো বিচ্ছিরি! যা, যা, এখান থেকে—আমাদের সঙ্গে তোকে আর খেলতে দেব না।'

বাগান থেকে ওরা তাকে তাড়িয়ে দিলে।

তারা-ঝরা ভুরু কুঁচকে বললে, 'কী? কী বললে ওরা? আমি কুয়োর ধারে গিয়ে জলের দিকে তাকাব—জল আমাকে বলে দেবে আমি কত সুন্দর!'

কুয়োর ধারে গিয়ে জলের দিকে তাকাল সে। তাই তো! তার মুখ ব্যাঙের মতো, তার শরীর যে সাপের মতো হয়ে গেছে! ঘাসের উপর লম্বা হয়ে পড়ে কাঁদতে-কাঁদতে সে নিজের মনে বললে, 'আমার পাপের জন্যেই আমার এ-দশা হল। আমি আমার মা-কে মা বলে মানি

নি, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি—এত অহংকার এত নিষ্ঠুরতা সইবে কেন? আমি এখন সমস্ত পৃথিবী ভরে আমার মা-কে খুঁজব—তাঁকে না-পাওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

কাঠুরের ছোট্ট মেয়ে তার কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বললে, 'তোমার রূপ না-হয় গেছেই, তাতে কী হয়েছে? আমাদের বাড়িতেই থাকো তুমি, আমি তোমাকে কক্‌খনো খ্যাপাব না।'

তারা-ঝরা বললে, 'না, তা হতে পারে না। আমি আমার মা'র প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি, তারই এই শাস্তি। আমি এখান থেকে চলে যাব—যতক্ষণ-না মা-কে খুঁজে পাই, যতক্ষণ-না মা'র ক্ষমা পাই, পৃথিবী ভরে শুধু ঘুরে-ঘুরে বেড়াব।'

ছুটে সে চলে গেল বনের মধ্যে 'মা, মা' বলে ডাকতে লাগল। কোনো উত্তর নেই। সারাদিন ভরে সে মা-কে ডাকল, তারপর সূর্য যখন অস্ত গেল, শুয়ে পড়ল পাতার বিছানায়। তার কাছ থেকে পশু-পাখিরা সব পালিয়ে গেল, তার হৃদয়হীনতার কথা কেউ তো ভোলেনি। একা-একা সে পড়ে রইল, শুধু তার শিয়রে বসে রইল একটা মস্ত কোলাব্যাঙ, আর একটা সাপ তার পায়ের কাছে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সকালে উঠে গাছ থেকে কয়েকটা তেতো জাম পেড়ে সে খেয়ে নিল, তারপর মস্ত বনের মধ্যে কাঁদতে-কাঁদতে আবার হাঁটতে লাগল। যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই সে তার মা'র খবর জিগ্যেস করে।

ছুঁচোকে সে বললে, 'তুমি তো মাটির তলায় যেতে পার—আমার মা কি সেখানে?'

ছুঁচো জবাব দিলে : 'আমি কেমন করে বলব? তুমি তো আমার চোখ অন্ধ করে দিয়েছ।'

ছোটপাখিকে সে বললে, 'উঁচু-উঁচু গাছের উপর দিয়ে উড়ে-উড়ে সমস্ত পৃথিবীটা তুমি তো দেখতে পাও—বল আমার মা-কে তুমি কি দেখেছ?'

পাখি বললে, 'তুমি খেলতে-খেলতে আমার পাখা ভেঙে দিয়েছ—কেমন করে আমি উড়ব?'

ছোট্ট কাঠবিড়ালি একা-একা মস্ত গাছের মধ্যে থাকে—তাকে সে জিগ্যেস করলে, 'আমার মা কোথায়, বলতে পার?'

কাঠবিড়ালি বললে, 'আমার মা-কে তুমি মেরেছ—এবার কি নিজের মা-কেও মারতে চাও?'

তারা-ঝরার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, মাথা নিচু করে সে ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টির কাছে ক্ষমা চাইল, তারপর সেই বুড়ি-ভিখিরিকে খুঁজে-খুঁজে আবার হাঁটতে লাগল। তিনদিনের পর সে বন পার হয়ে নিম্নভূমিতে নেমে এল—ওখানে লোকালয়ের আরম্ভ।

যে-গ্রামেই সে যায়, সেখানেই ছেলেমেয়েরা তাকে দুয়ো দেয়, তার গায়ে ঢিল ছোড়ে। কেউ তাকে আশ্রয় দেয় না, কেউ তাকে একটু শোবার জায়গা দেয় না—সকলেরই ভয়, তার চোখ লেগে সংসার উচ্ছন্নে যাবে, শস্য নষ্ট হবে। বাড়ির চাকররাও তাকে দূর-দূর করে তাড়ায়, তার প্রতি কারোরই একফোঁটা দয়া নেই।

তিনটি বছর সে এমনি ঘুরে-ঘুরে বেড়াল, কিন্তু কোনোখানেই সেই বুড়ি-ভিখিরির কোনো খবর পেল না, তার মা'র কোনো খবর পেল না। প্রায়ই মনে হত, রাস্তায় মা-কে সে তার ঠিক সামনেই দেখতে পাচ্ছে, ছুটতে-ছুটতে তার পা কেটে রক্ত বেরুত কিন্তু মা-কে সে ধরতে পারত না—আর সে-রাস্তায় যাদের বাসা তারা বলত যে, তার মা-কে, কি ও-রকম কাউকেই তারা কখনো দ্যাখেনি—তার দুঃখ নিয়ে হাসাহাসি করত তারা।

তিনটি বছর সে পৃথিবীতে ঘুরে-ঘুরে বেড়াল—সে-পৃথিবীতে স্নেহ নেই, দয়া নেই, ভালোবাসা নেই—তার গৌরবের দিনে তার গর্বের দিনে যে-পৃথিবী সে বানিয়েছিল, এ যেন ঠিক তারই মতো নিষ্ঠুর।

নদীর ধারে শক্ত দেয়ালে ঘেরা মস্ত শহর, একদিন সন্ধ্যাবেলা সে সেই শহরের সিংহদরজার কাছে এসে দাঁড়াল। শরীর ক্লান্ত, পা অবশ, তবু সে সেই শহরে ঢুকতে গেল। কিন্তু প্রহরীরা তাকে বাধা দিলে। তলোয়ার উঁচিয়ে কর্কশস্বরে তারা বললে, 'কী চাও তুমি? এখানে তোমার কী দরকার?'

'আমি আমার মা-কে খুঁজছি,' সে বললে। 'আমাকে দয়া করো, আমাকে যেতে দাও—আমার মা হয়তো এই শহরেই আছেন।'

ওরা তাকে টিটকিরি দিয়ে হেসে উঠল। একজন হাতের ঢাল নামিয়ে রেখে কালো দাড়ি নেড়ে বললে, 'আহা রে, তোর মা তোকে দেখে আহ্লাদে গলে যাবেন! যা চেহারার ছিরি! পচা পুকুরে যে-সাপ কিলবিল করে, কাদার মধ্যে যে-কোলাব্যাঙ গলা ডুবিয়ে থাকে, তাদের চেয়েও তুই কুচ্ছিত! ভাগ্ এখান থেকে! ভাগ্! এখানে তোর মা-টা কেউ থাকে না।'

আর-একজন, তার হাতে একটা হলদে নিশেন, বললে, 'কে তোর মা? কেন খুঁজছিস তুই তাকে?'

সে বললে, 'আমার মা আমার মতোই ভিখিরি। আমি তার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি। আমাকে দয়া করো তোমরা, আমাকে যেতে দাও, মা'র ক্ষমা আমি চাই, তোমরা বাধা দিয়ো না। হয়তো মা এই শহরেই আছেন।'

কিন্তু প্রহরীরা তাকে যেতে দিলে না, বল্লম দিয়ে তাকে খোঁচা দিলে। কাঁদতে-কাঁদতে সে ফিরে এল।

তখন প্রহরীদের ভিড় ঠেলে অন্য-একজন এল এগিয়ে। তার বর্মে পিতলের ফুল বসানো, তার টুপিতে একটা পাখাওলা সিংহ গুড়িশুড়ি মেরে বাসে। প্রহরীদের সে জিগ্যেস করলে, 'কে হে লোকটা ঢুকবার জন্যে পিড়াপিড়ি করছিল?' ওরা বললে, 'একটা ভিখিরি—ভিখিরির ছেলে। ওটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'আহা, তাড়ালে কেন?' সে হেসে উঠে বললে, 'ও গোলামি করতে পারত—ওকে কারো কাছে বেচে দেয়া যাক—ওর দাম হবে একপাত্র মিঠে মদের দাম।'

ঠিক সেই সময়ে এক অলুক্ষণে চেহারার বুড়ো সেখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সে বলে উঠল, 'রাজি! আমি ওকে ঐ দামে কিনব।' কড়ি দিয়ে কিনে সে তারা-ঝরাকে হাতে ধরে শহরের ভিতরে নিয়ে এল।

অনেকগুলো রাস্তা পার হয়ে যেখানে তারা এল, সেখানে বেদানা-গাছে ঢাকা একটা দেয়ালে ছোট্ট দরজা বসানো। বুড়ো একটা লাল স্ফটিক-বসানো আংটি দিয়ে দরজাটা ছুঁতেই সেটা খুলে গেল, তারপর পাঁচ-ধাপ কাঁসার সিঁড়ি নেমে তারা এল একটা বাগানে। কালো-কালো আফিম-ফুলে আর পোড়ামাটির সবুজ-সবুজ হাঁড়িতে বাগানটি ভরে রয়েছে। বুড়ো তার পাগড়ি থেকে একটা নকশা-আঁকা রেশমি রুমাল বের করে তা দিয়ে তারা-ঝরার চোখ বাঁধলে, তারপর নিজের সামনে তাকে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে চলল। তারা-ঝরার চোখ থেকে যখন রুমাল খুলে নেয়া হল তখন সে দেখল, সে আছে মাটির তলায় একটা অন্ধ বন্ধ-কুঠুরিতে, শিঙের লণ্ঠনের মিটিমিটি আলো ছাড়া আর আলো সেখানে নেই।

বুড়ো তার সামনে খানিকটা বাসি পচা রুটি রেখে বললে, 'খা।' খানিকটা নোনতা-নোনতা জল রেখে আবার বললে, 'খা।' তার খাওয়া হয়ে গেলে বুড়ো বেরিয়ে গেল, বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে লোহার শিকল দিল তুলে।

লিবিয়া দেশের সবচেয়ে চতুর জাদুকর ঐ বুড়ো। নীলনদের তীরে মৃত আত্মার কবরের ধারে যার বাসা, এমন একজনের কাছে সে তার বিদ্যে শিখেছিল। পরের দিন সকালে তারা-ঝরার কাছে এসে কটমট করে তাকিয়ে সে বললে, 'শোন্—এই শহরের সিংহদ্বারের কাছে একটা বন আছে, সেখানে আছে তিনতাল সোনা। একটা শাদা সোনা, একটা হলদে সোনা, আর একটা লাল সোনা। আজ তুই শাদা সোনার তাল আমাকে এনে দিবি—যদি আনতে না পারিস তোকে একশো বেত মারব। শিগ্‌গির যা—আমি সূর্যাস্তের সময় বাগানের দরজায় তোর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব। দেখিস—শাদা সোনাটা ঠিক আনিস কিন্তু—না হলে তোকে আর আস্ত রাখব না। মনে রাখিস, তুই আমার গোলাম—একপাত্র মদের দাম দিয়ে তোকে আমি কিনেছি!'

এই বলে বুড়ো সেই নকশা-আঁকা রেশমি রুমাল দিয়ে তারা-ঝরার চোখ বেঁধে দিয়ে তাকে ধরে-ধরে নিয়ে এল আফিম-ফুলের বাগান পেরিয়ে, পাঁচ-ধাপ কাঁসার সিঁড়ি বেয়ে উঠে, আংটি দিয়ে ছোট্ট দরজাটি খুলে একেবারে রাস্তায়।

তারা-ঝরা শহরের সিংহদ্বার দিয়ে বেরিয়ে এল সেই বনে, যে-বনের কথা জাদুকর বলেছিল।

বাইরে থেকে বনটি খুব সুন্দর। মনে হয় ওর ভিতরে কত পাখির গান, কত ফুলের গন্ধ। তারা-ঝরা বেশ খুশি হয়েই বনের মধ্যে ঢুকল। কিন্তু তার নিশ্বাসেই যেন বনের সমস্ত রূপসৌরভ শুকিয়ে ঝরে গেল; যেদিকে সে যায়, সেদিকেই মাটিতে কর্কশ কাঁটা গজিয়ে উঠে তাকে ঘিরে ধরে; বিশ্রী বিছুটির কামড়ে, শেয়ালকাঁটার খোঁচায় তাকে পাগল করে দেয়। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত সে শাদা সোনা খুঁজে-খুঁজে বেড়াল, কিন্তু কোথাও পেল না। সূর্যাস্তের সময় অঝোরে কাঁদতে-কাঁদতে সে বাড়ির দিকে মুখ ফেরাল—হায়রে, তার কপালে আজ কী আছে তা তো সে ভালোই জানে। বনের বাইরে সে যখন প্রায় এসেছে, ঝোপের পিছন থেকে হঠাৎ একটা চিৎকার শুনতে পেল। যেন যন্ত্রণার আর্তস্বর। নিজের দুঃখ ভুলে সে ছুটে গেল সেখানে, গিয়ে দেখল ব্যাধের ফাঁদে ধরা পড়েছে একটা খরগোশ।

তারা-ঝরার দয়া হল। খরগোশটাকে ছেড়ে দিয়ে বললে, 'আমি ক্রীতদাস, তবু তোমার মুক্তি আমার হাতেই হল।'

খরগোশ বললে, 'তুমি আমাকে মুক্তি দিলে, এর কোনো প্রতিদান আমি কি তোমাকে দিতে পারি?'

তারা-ঝরা বললে, 'একতাল শাদা সোনা খুঁজছি আমি—কোনোখানেই খুঁজে পাচ্ছিনে। অথচ তা যদি না-নিয়ে যেতে পারি, তাহলে বেত খেয়ে মরতে হবে।'

খরগোশ বললে, 'আমার সঙ্গে এসো। আমি জানি সেই শাদা সোনা কোথায় লুকানো আছে, কেনই-বা লুকোনো আছে—তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব।'

খরগোশের সঙ্গে যেতে-যেতে তারা-ঝরা দেখলে—বিরাট এক গাছের কোটরে একতাল শাদা সোনা। ফুর্তিতে আত্মহারা হয়ে সে সেটা তুলে নিল, তারপর খরগোশকে বললে, 'যে-উপকার আমি তোমার করেছিলাম তার অনেকগুণ তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে, যে-দয়া তোমাকে আমি দেখিয়েছি তার একশো গুণ ফিরে পেলাম।'

'না। তুমি আমাকে যেমন করেছিলে, আমিও তোমাকে তেমনি করেছি।' এই বলে খরগোশ দ্রুতপদে ছুটে চলে গেল, আর তারা-ঝরা চলল শহরের দিকে।

শহরের সিংহদ্বারে একজন বসে ছিল, সে কুষ্ঠরোগী। ছাইরঙের কাপড়ে-ঢাকা তার মুখ, তার ফাঁক দিয়ে দুটো চোখ লাল কয়লার মতো জ্বলছে। তারা-ঝরাকে আসতে দেখে সে তার কাঠের বাটিতে খটখট শব্দ করে ঠুনঠুন ঘণ্টা বাজিয়ে বললে, 'দয়া করে কিছু ভিক্ষে দাও বাবা, না-দিলে আমি না-খেয়ে মরব। আমাকে ওরা শহর থেকে বের করে দিয়েছে—আমার ওপরে কারোরই দয়া নেই।'

তারা-ঝরা বললে, 'হা ঈশ্বর, আমার কাছে তো কিছুই নেই, শুধু একতাল সোনা আছে। আমি ক্রীতদাস, ঐ সোনা যদি নিয়ে যেতে না-পারি তাহলে আমাকে বেত খেয়ে মরতে হবে।'

কিন্তু কুষ্ঠরোগী কেবল কেঁদে-কেঁদে অনুনয় করতে লাগল। তারা-ঝরার দয়া হল, শাদা সোনার তাল সে তাকে দিয়ে দিলে। জাদুকরের বাড়িতে সে যখন ফিরে এল, জাদুকর দরজা খুলে দিয়ে তাকে ভিতরে এনে জিগ্যেস করলে, 'এনেছিস শাদা সোনার তাল?'

তারা-ঝরা জবাব দিলে, 'না, আনতে পারিনি।'

জাদুকর মেরে-মেরে তার গায়ের চামড়া তুলে দিলে, তারপর তার সামনে একটা খালি থালা রেখে বললে, 'খা।' একটা খালি গেলাশ রেখে বললে, 'এই নে জল।'

পরের দিন সকালে জাদুকর এসে বললে, 'দ্যাখ, আজ যদি হলদে সোনার তাল এনে না দিস, তাহলে তোকে তিনশো বেত মারব আর সারাজীবন তুই আমার গোলামি করবি।'

তারা-ঝরা আবার গেল বনের মধ্যে, সারাদিন ধরে হলদে সোনার তাল খুঁজল, কিন্তু কোনোখানেই পেল না। সূর্যাস্তের সময় সে বসে-বসে কাঁদতে লাগল। এমন সময় তার কাছে এসে দাঁড়াল সেই ছোট্ট খরগোশ, যাকে সে ব্যাধের ফাঁদ থেকে বাঁচিয়েছিল।

খরগোশ বললে, 'কেন কাঁদছ তুমি? আর এই বনে খুঁজছই-বা কী?'

তারা-ঝরা বললে, 'এখানে একতাল হলদে সোনা লুকোনো আছে—সেটা যদি আমি খুঁজে বের করে নিয়ে যেতে না-পারি তাহলে এখন মরতে হবে মার খেয়ে আর সারাজীবন করতে হবে গোলামি।'

খরগোশ বললে, 'এসো আমার সঙ্গে।' বনের ভিতর দিয়ে ছুটতে-ছুটতে খরগোশ তাকে একটা জায়গায় নিয়ে এল, সেখানে খানিকটা ঝরনার জল জমে আছে। সেই জলের তলায় হলদে সোনা পাওয়া গেল।

তারা-ঝরা বললে, 'কী করে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব জানিনে। এই নিয়ে দু-বার তুমি আমাকে বাঁচালে।'

'তুমিই তো আমাকে আগে দয়া করেছিলে,' বলে খরগোশ তাড়াতাড়ি ছুটে চলে গেল।

তারা-ঝরা তার ঝুলির মধ্যে হলদে সোনার তালটা ভরে নিয়ে শহরের দিকে যেতে লাগল। তাকে আসতে দেখে কুষ্ঠরোগী ছুটে এসে বললে, 'আমাকে কিছু দাও বাবা, নইলে আমি আর বাঁচিনে।'

তারা-ঝরা বললে, 'আমার ঝুলিতে মাত্র একতাল হলদে সোনা আছে—এ যদি আমি নিয়ে না-যেতে পারি তাহলে আমাকে মার খেয়ে মরতে হবে আর সারাজীবন ভরে গোলামি করতে হবে।' কিন্তু কুষ্ঠরোগী কেঁদে এমন করে বলতে লাগল যে তারা-ঝরার দয়া হল—হলদে সোনার তাল সে তাকে দিয়ে দিল।

জাদুকরের বাড়িতে সে যখন এল, জাদুকর দরজা খুলে দিয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে এসে বললে, 'কোথায় আমার হলদে সোনা? এনেছিস?' তারা-ঝরা জবাব দিলে, 'না আনি নি।' জাদুকর মারতে-মারতে তার রক্ত বের করে দিলে, তারপর তার হাতে-পায়ে শিকল বেঁধে বন্ধ-কুঠুরির মধ্যে তাকে ছুড়ে ফেলল।

পরের দিন সকালে জাদুকর এসে বলল, 'আজ যদি আমাকে লাল সোনা এনে দিস তাহলে তোকে ছেড়ে দেব—আর যদি না-আনিস তাহলে তোকে মেরেই ফেলব।'

আবার গেল তারা-ঝরা বনের মধ্যে, আবার খুঁজে-খুঁজে বেড়াল সারাদিন, কিন্তু লাল সোনা কোনোখানেই পেলে না। সন্ধ্যাবেলা সে বসে-বসে কাঁদছে এমন সময় তার কাছে এল সেই ছোট খরগোশ।

খরগোশ বললে, 'যে-লাল সোনা তুমি খুঁজছ তা তোমার পিছনেই ঐ গুহার মধ্যে আছে। আর কেঁদো না, মন ভালো করো।'

তারা-ঝরা বলে উঠল, 'কী আমি করতে পারি তোমার জন্যে? এই নিয়ে তিনবার তুমি আমাকে রক্ষা করলে।'

'না, তুমিই আমাকে প্রথমে দয়া করেছিলে,' বলে খরগোশ দ্রুতবেগে ছুটে চলে গেল।

তারা-ঝরা গুহার মধ্যে ঢুকে দেখল, সবচেয়ে দূরের কোণায় লাল সোনা ঝলমল করছে। সোনা তুলে নিয়ে সে তার ঝুলির মধ্যে রাখল, তারপর তাড়াতাড়ি যেতে লাগল শহরের দিকে। তাকে আসতে দেখে কুষ্ঠরোগী পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হেঁকে বললে, 'ঐ লাল সোনা আমাকে দাও, নয়তো আমি বাঁচব না।' তারা-ঝরার আবার তার পরে দয়া হল, লাল সোনার তাল তাকে দিয়ে বললে, 'আমার চেয়ে তোমার প্রয়োজন বেশি।' তবু মন তার অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল—হায়রে, আজ তার কপালে না-জানি কী আছে! কিন্তু এ কী কাণ্ড! শহরের সিংহদরজার ভিতর দিয়ে সে যখন আসছে, প্রহরীরা মাথা নিচু করে তাকে প্রণাম করে বললে, 'কী সুন্দর আমাদের প্রভু!' তার পিছনে ভিড় জমে গেল, তারা সবাই বলতে লাগল, 'এত সুন্দর কি পৃথিবীতে আর-কেউ!' তারা-ঝরা কাঁদতে-কাঁদতে নিজের মনে বললে, 'ওরা আমাকে ঠাট্টা করছে, আমার দুঃখকে বিদ্রূপ করছে ওরা!' ভিড় ক্রমে বাড়তে লাগল। ভিড়ের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলল সে, আর খানিকপরে দেখল সে একটা প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে রাজপ্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজপ্রাসাদের দরজা খুলে গেল—মন্ত্রী, সেনাপতি, পুরোহিত সবাই বেরিয়ে এল তাকে অভ্যর্থনা করতে। তার সামনে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে তারা বললে, 'আপনি আমাদের প্রভু, আমাদের রাজপুত্র, আপনার জন্য কতকাল আমরা অপেক্ষা করেছি।'

তারা-ঝরা বললে, 'আমি রাজপুত্র নই, অতি দরিদ্র ভিখারিনির পুত্র আমি। কেন তোমরা বলছ যে আমি সুন্দর, আমি তো জানি আমি কত কুৎসিত!'

তখন সেই একজন, যার বর্মে পিতলের ফুল-বসানো, আর যার টুপিতে পাখাওলা সিংহ হামাগুড়ি দিচ্ছে, সে তার ঢাল তুলে ধরে বললে, 'প্রভু, এ কীরকম কথা যে আপনি সুন্দর নন!'

তারা-ঝরা সেই ঢালের দিকে তাকিয়ে দেখলে তার মুখের ছায়া। তার মুখশ্রী আবার আগের মতো হয়েছে, ফিরে এসেছে তার সমস্ত রূপ—আর নিজের চোখে সে এমন-কিছু দেখল যা আগে কখনো দ্যাখেনি।

পাত্র-মিত্র-অমাত্য সবাই তখন নতজানু হয়ে বললে, 'অনেক আগে দৈববাণী হয়েছিল যে আজকের দিনে তিনি আসবেন আমাদের কাছে, যিনি আমাদের রাজা, আমাদের

প্রভু। এই নিন আপনার মুকুট, এই আপনার রাজদণ্ড; ন্যায়ধর্মে, দয়া-ধর্মে আমাদের ওপর রাজত্ব করুন।'

তারা-ঝরা বললে, 'আমি অতি অযোগ্য, কেননা যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন, আমার সেই মা-কে আমি গ্রহণ করিনি। যতদিন-না মা-কে আমি পাই, যতদিন-না মা-র ক্ষমা আমাকে ধন্য করে, ততদিন আমার শান্তি নেই। আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা, আবার আমাকে পৃথিবী-ভরে খুঁজে বেড়াতে হবে, এখানে দাঁড়াবার সময় আমার নেই।'

বলতে-বলতে সে রাস্তার দিকে তাকাল, যে-রাস্তাটি শহরের সিংহদ্বারের দিকে গেছে। রাস্তার ভিড় প্রহরীরা অতিকষ্টে সামলে রেখেছে—ভিড়ের মধ্যে সে দেখতে পেল সেই ভিখারিনিকে, যে তার মা, তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই কুষ্ঠরোগী, যাকে সে পথের ধারে বসে থাকতে দেখেছিল।

আনন্দে তার মুখ দিয়ে চিৎকার বেরুল, ছুটে গিয়ে সে তার মা-র কাছে হাঁটু ভেঙে বসে তাঁর ক্ষত-বিক্ষত পায়ে চুমু খেতে-খেতে চোখের জলে পা ভিজিয়ে দিল। ধুলোর মধ্যে মাথা রেখে সে এমন করে কাঁদতে লাগল, যেন তার বুক ভেঙে যাবে। কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'মা, আমার গৌরবের দিনে আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছি, আমার দুঃখের দিনে তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমাকে ঘৃণা করেছি; তোমার ভালোবাসা আমাকে দাও। আমার মা-কে আমি চিনতে পারিনি, কিন্তু তোমার সন্তানকে তুমি কোলে টেনে নাও।'

কিন্তু ভিখারিনি একটি কথাও বললে না।

তখন তারা-ঝরা দু-হাত বাড়িয়ে কুষ্ঠরোগীর শাদা পা দুটি জড়িয়ে ধরে বললে, 'তিনবার আমার দয়ার ভাগ তোমাকে দিয়েছি—আমার মা-কে বলো, তিনি আমাকে কিছু বলুন।'

কিন্তু কুষ্ঠরোগী একটি কথাও বললে না।

আরো ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে-কাঁদতে সে বললে, 'মা, এত দুঃখ আমি আর সইতে পারিনে। আমাকে তুমি ক্ষমা করো, আমি আবার বনে ফিরে যাই।'

তখন ভিখারিনি তার মাথায় হাত রেখে বললে, 'ওঠো।' কুষ্ঠরোগীও তার মাথায় হাত রেখে বললে, 'ওঠো।'

তারা-ঝরা উঠে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকাল। কোথায় সেই ভিখারিনি! কোথায় সেই কুষ্ঠরোগী! একজন রাজা আর একজন রানি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

রানি বললেন, 'এই তোমার পিতা, যাকে তুমি দয়া করেছিলে।'

রাজা বললেন, 'এই তোমার মাতা, যার পা তুমি চোখের জলে ধুয়ে দিয়েছ।'

তার গলা জড়িয়ে ধরে তার মা-বাবা তাকে চুমু খেলেন, তারপর তাকে প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। অতি সুন্দর বসনে-ভূষণে সাজানো হল তাকে; মাথায় তার মুকুট, হাতে রাজদণ্ড, নদীর ধারের সেই মহানগরীর রাজা হল সে। তার করুণায়, তার সুবিচারে সকলেই মুগ্ধ। সেই বুড়ো বিশ্রী জাদুকরকে সে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল, কাঠুরে আর কাঠুরে-বৌকে পাঠাল অনেক দামি-দামি উপহার, তাদের ছেলেমেয়েদের সম্মানে-সৌজন্যে ঢেকে দিল। পশু-পাখির প্রতি কোনোরকম নিষ্ঠুরতা সে হতে দিলে না, সকলকে শেখাল দয়া করতে, ভালোবাসতে; দরিদ্রকে দান করলে অন্নবস্ত্র; তার রাজত্বে সুখ-শান্তি-প্রাচুর্য আর ধরে না।

কিন্তু বেশিদিন রাজত্ব করতে সে পারলে না। এত দুঃখ-কষ্ট পেয়ে, অমন তীব্র অগ্নিপরীক্ষা পার হয়ে তিনবছর পরেই সে মারা গেল।

আর তারপরে আরম্ভ হল খুব খারাপ এক রাজার রাজত্ব।

স্বার্থপর দৈত্য

রোজ বিকেলে ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে ছোট ছেলেমেয়েরা দৈত্যের বাগানে খেলতে যায়।

মস্ত সুন্দর বাগান, নরম সবুজ ঘাসে- ছাওয়া। এখানে-ওখানে, ঘাসের মাথায়-মাথায় ফুটছে আকাশের তারার মতো ফুটফুটে ফুল; বসন্তকালে বারোটা পিচগাছে সোনালি আর শাদা অজস্র মঞ্জরি ধরত আর হেমন্ত এলে ফলত রাশি-রাশি পাকা সোনালি ফল। পাখিরা গাছে বসে এত মিষ্টি গান করত যে ছেলেরা খেলা থামিয়ে চুপ করে শুনত সে-গান। 'কী মজা!' হেসে-হেসে তারা বলত, 'কী মজা!'

একদিন কিন্তু দৈত্য ফিরে এল। সে গিয়েছিল তার মামাতো ভাই খোক্ষসের বাড়ি বেড়াতে, সাত বছর ছিল সেখানে। সাত বছর যখন কেটে গেল, খোক্ষসের সঙ্গে তার সব কথাও ফুরুল, কেননা দৈত্যের কথার পুঁজি খুব বেশি ছিল না। তখন সে ভাবলে, এবার বাড়ি ফেরা যাক। ফিরে দেখলে ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছে তার বাগানে।

'কী করছ এখানে তোমরা?' খুব মোটা গলায় সে হাঁক দিলে, আর ছোটরা ভয় পেয়ে দিল দৌড়।

দৈত্য বললে, 'আমার বাগান হল আমার নিজের—এ তো সোজা কথা। এখানে খেলতে হয় তো আমিই খেলব—আর কাউকে খেলতে দেব না।'

এই-না বলে বাগানের চারদিকে তুললে প্রকাণ্ড উঁচু দেয়াল, আর একটা নোটিশ লাগিয়ে দিল—

এই বাগানে ঢুকিলে
ফৌজদারিতে সোপর্দ করা হইবে।

বড় স্বার্থপর ছিল দৈত্য। বেচারা ছোটদের এখন আর খেলবার জায়গা রইল না। তারা গেল রাস্তায় খেলতে, কিন্তু রাস্তা-ভরা ধুলো আর শক্ত কাঁকর, মোটেও ভালো লাগল না তাদের।

ইস্কুল শেষ হয়ে গেলে তারা সেই উঁচু দেয়ালেরই আশেপাশে ঘুরে বেড়াত। 'কী সুন্দর বাগান এর ভিতরে'—এ ছাড়া তাদের মুখে আর কথা নেই। 'কী মজা লাগত সেখানে!'

তারপর বসন্তকাল এল, আর সমস্ত দেশ ভরে ছোট-ছোট মঞ্জরি আর ছোট-ছোট পাখি। শুধু দৈত্যের বাগানেই এখনো শীত।

সে-বাগানে তো কোনো শিশু নেই, তাই সেখানে কোনো পাখি গান গায় না, কোনো ফুলও ফোটে না। একবার টুকটুকে একটি ফুল ঘাসের তলা থেকে মাথা তুলেছিল, কিন্তু যেই-না সে দেখল ঐ নোটিশ টাঙানো, ছোটদের কথা ভেবে তার এমন মন-খারাপ হয়ে গেল যে সে ফের ঢুকল মাটির তলায়, পড়ল ঘুমিয়ে। খুশি হল শুধু তুষার আর বরফ। তারা বললে, 'বসন্ত এ-বাগানে ঢুকতে ভুলে গেছে—কী মজা। বারোমাস এখানে আমরাই থাকব।' তুষার বিছিয়ে দিলে ঘাসের উপর তার লম্বা শাদা চাদর, আর বরফ গাছগুলোকে এঁকে দিলে রুপোলি রঙে। কনকনে উত্তরে হাওয়াকে তারা নেমন্তন্ন করে পাঠালে, হৈ-হৈ করতে-করতে সে এল। সারাশরীর তার বিদঘুটে ভারী কাপড়ে জড়ানো, সারাটা দিন সে বাগানে দাপাদাপি চিৎকার করে বেড়াচ্ছে। 'ভারি সুন্দর জায়গা তো', সে বললে। 'একবার শিলাবৃষ্টি আসুক বেড়াতে।'

এল শিলাবৃষ্টি। রোজ তিনঘণ্টা ধরে দৈত্যের প্রাসাদের ছাদের উপর সে এমন হুড়মুড় দুড়দাড় করে বেড়াল যে ছাদের টালিগুলো সবই প্রায় ভেঙে গেল; আর তারপর বাগানের মধ্যে প্রাণপণে সে ছুটোছুটি করতে লাগল—সে একখানা কাণ্ড। পরনে তার ছাইরঙের কাপড় আর তার নিশ্বাস বরফের মতো ঠাণ্ডা।

জানলায় বসে, ঠাণ্ডা শাদা বাগানের দিকে তাকিয়ে স্বার্থপর দৈত্য মনে-মনে বললে, 'এবার বসন্ত আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন? শীতটা এখন কাটলেই হয়।'

কিন্তু দৈত্যের বাগানে না এল বসন্ত, না এল গ্রীষ্ম। সেখানে রইল বারোমাস শীত; উত্তরে হাওয়া আর শিলাবৃষ্টি তুষার গাছপালার মধ্যে নেচে-নেচে বেড়াতে লাগল।

একদিন সকালে দৈত্য বিছানায় জেগে শুয়ে আছে, এমন সময় ভারি সুন্দর গান এল তার কানে। সে-গান তার কানে এমন মধুর লাগল যে সে ভাবলে নিশ্চয়ই রাজপ্রাসাদের ওস্তাদরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আসলে কিন্তু ছোট্ট একটি দোয়েল তার জানলার বাইরে বসে শিস্ দিচ্ছিল; কিন্তু দৈত্য কিনা অনেকদিন পাখির গান শোনেনি, তাই তার মনে হল এমন গান পৃথিবীতে আর হয় না। তারপর তার মাথার উপর থামল শিলাবৃষ্টির নাচ, থামল উত্তরে হাওয়ার গর্জন, আর খোলা জানলা দিয়ে ভারি মিষ্টি একটি গন্ধ এসে ছড়িয়ে পড়ল। 'বোধ হচ্ছে এতদিনে বসন্ত এল,' বলে দৈত্য একলাফে বিছানা থেকে উঠে জানলার বাইরে তাকাল।

কী দেখল সে?

অতি অপরূপ দৃশ্য তার চোখে পড়ল। দেয়ালের মধ্যে ছোট একটু গর্ত ছিল, তাই দিয়ে কেমন করে শিশুরা ঢুকেছে ভিতরে, গাছের ডালে বসে দুলছে। প্রত্যেক গাছে একটি করে শিশু। আর গাছেরা ওদের দেখতে পেয়ে এত খুশি হয়েছে যে তারা ফুটিয়েছে শরীর ভরে কত ফুলের মঞ্জরি, আর নাড়ছে ফুলন্ত ডালগুলো ওদের মাথার উপর। পাখিরা খুশিতে কিচমিচ করতে-করতে চারদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে, আর সবুজ ঘাসের ফাঁক দিয়ে ফুলেরা হেসে-হেসে উঁকি দিচ্ছে। সবই সুন্দর, শুধু দূরের এককোণে এখনো রয়েছে শীত। সেখানে একটা গাছের

তলায় ছোট একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। এতই ছোট সে যে গাছটার একটা ডালও সে নাগাল পাচ্ছে না, কেঁদে-কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সে-গাছটাও এখনো একেবারে বরফে আর তুষারে মোড়া, উত্তরে হাওয়া তার মাথার উপর দিয়ে গোঁ-গোঁ করে উড়ে বেড়াচ্ছে। 'এসো, উঠে এসো,' বলে গাছটা তার ডালগুলো যতটা পারছে নুইয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ছেলেটি বড়ই ছোট।

বাইরে তাকিয়ে দেখতে-দেখতে দৈত্যের হৃদয়ে দয়া হল। 'সত্যি, কী স্বার্থপরের মতো কাজ আমি করেছি।' সে বললে। 'এখন বুঝতে পারছি বসন্ত কেন আমার বাগানে আসেনি। যাই, ঐ ছোট্ট ছেলেটিকে গাছের ডালে তুলে দিয়ে আসি। তারপর এই দেয়াল আমি ভেঙে ফেলব, আর আমার এই বাগানে চিরকাল হবে ছোটদের খেলা।' সে যা করেছিল তার জন্যে সত্যি অনুতাপ হল তার।

গেল সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, সামনের দরজাটা আস্তে খুলে বেরিয়ে এল বাগানে। কিন্তু শিশুরা যেই তাকে দেখল, অমনি ভয়ে আঁতকে উঠে দিলে দৌড়—আর সমস্ত বাগানে আবার শীত নেমে এল। রইল শুধু সেই ছোট্ট ছেলে; তার চোখ কিনা জলে ভরে ছিল, তাই দৈত্যকে সে দেখতে পায়নি। তখন দৈত্য করলে কী, চুপি-চুপি ওর পিছনে এসে ওকে আস্তে তুলে গাছের উপর বসিয়ে দিলে। তক্ষুনি গাছটা হাজার মঞ্জরিতে ফুটে উঠল, পাখিরা তার ডালে-ডালে বসে গান ধরল, আর ছোট্ট ছেলেটি খুশিতে দৈত্যের গলা জড়িয়ে ধরল। তখন অন্য ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারল যে দৈত্য আর আগেকার মতো বদ্‌মেজাজি নেই, দৌড়ে ফিরে এল তারা, তাদের সঙ্গে ফিরে এল বসন্ত। 'শুনেছ ছোটরা, এ-বাগান এখন তোমাদের।' এই বলে মস্ত এক কুড়ুল হাতে নিয়ে সে ভেঙে ফেললে দেয়াল। আর দুপুরবেলা বাজারে যাবার পথে সবাই অবাক হয়ে দেখলে যে, দৈত্য তার বাগানে ছোটদের সঙ্গে ছুটোছুটি খেলছে—অত সুন্দর বাগান কখনো চোখে দ্যাখেনি তারা।

সারাদিন খেলা করলে তারা, তারপর সন্ধেবেলায় এল দৈত্যের কাছে বিদায় নিতে।

'কিন্তু তোমাদের ছোট্ট সঙ্গীকে তো দেখছি না,' বললে দৈত্য। 'যাকে আমি গাছের উপর তুলে দিলাম।' সে ধরেছিল তার গলা জড়িয়ে, তাই দৈত্য তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছিল। 'আমরা জানিনে তো,' ছোটরা জবাব দিলে। 'সে চলে গেছে বুঝি?'

'তাকে বোলো তোমরা, কাল যেন সে এখানে আসেই, যেন না ভোলে'—বললে দৈত্য। কিন্তু ছোটরা তো জানে না সে কোথায় থাকে, আগে কখনো দ্যাখেওনি তাকে।

দৈত্যের বড় মন-খারাপ হয়ে গেল।

রোজ বিকেলবেলা, ইস্কুল-ছুটির পর ছোটরা আসে দৈত্যের সঙ্গে খেলতে। কিন্তু সেই ছোট্ট ছেলেটি, দৈত্য যাকে ভালোবেসেছিল তাকে আর দেখা যায় না। ছোটদের সকলের সঙ্গেই দৈত্যের খুব ভাব, কিন্তু তার সেই প্রথম ছোট্ট বন্ধুটির জন্য তার বড় মন-কেমন করে, প্রায়ই বলে তার কথা। 'বড় খুশি হতাম তার দেখা পেলে।'

বছরের পর বছর কেটে গেল, দৈত্য এখন বুড়ো হয়েছে, সে আর ছুটোছুটি খেলতে পারে না; মস্ত চেয়ারে বসে-বসে ছোটদের খেলা দ্যাখে আর মনে-মনে নিজের বাগানের তারিফ করে। 'অনেক সুন্দর ফুল আমার আছে,' সে বললে, 'কিন্তু শিশুরা হচ্ছে ফুলেদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর।'

শীতের এক সকালবেলা সে তাকাল জানলা দিয়ে বাইরে। এখন আর শীতের ওপরে তার রাগ নেই, কেননা সে জানে এ তো বসন্তই ঘুমিয়ে আছে আর ফুলেরা নিচ্ছে জিরিয়ে।

হঠাৎ অবাক হয়ে সে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে বার-বার তাকাতে লাগল। কী আশ্চর্য! বাগানের ঐ দূরের কোণে একটা গাছ ফুটফুটে শাদা মঞ্জরিতে ঢাকা। ডালগুলো তার সব সোনালি আর তা থেকে ঝুলছে ঝকঝকে রুপোলি ফল, আর তার তলায় দাঁড়িয়ে সেই ছোট্ট ছেলেটি, যাকে সে ভালোবেসেছিল।

গেল সে দৌড়ে নিচে নেমে, গেল বেরিয়ে বাগানে। তাড়াতাড়ি ঘাস পার হয়ে সে এল, সেই শিশুর কাছে। আর খুব কাছে যখন এল, রাগে লাল হয়ে উঠল তার মুখ, বলে উঠল, 'কার এমন সাহস যে তোমাকে মেরেছে?' কারণ ঐ ছোট্ট ছেলেটির ছোট দুটি হাতে সে দেখতে পেল রক্তের দাগ, আর রক্তের দাগ তার ছোট্ট দুটি পায়ে।

'কার এত সাহস তোমাকে মেরেছে?' দৈত্য চিৎকার করে বললে, 'বলো আমাকে এক্ষুনি, আমি আমার লম্বা তলোয়ার বের করে তাকে শেষ করব।'

ছোট ছেলেটি বললে, 'না—না, এ-আঘাত ভালোবাসার, আর-কিছু নয়।'

'কে তুমি?' দৈত্য বললে। আর তার মনে কেমন একটা অদ্ভুত ভয়ের ভাব নেমে এল—ঐ শিশুর সামনে নতজানু হয়ে সে বসে পড়ল।

ছোট ছেলেটি দৈত্যের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, 'আমাকে তুমি তোমার বাগানে খেলা করতে দিয়েছিলে—আজ তুমি আসবে আমার বাগানে—সে হল স্বর্গ।'

আর বিকেলবেলায় যখন ছেলেমেয়ের দল হুটোপুটি করে বাগানে এসে ঢুকল, তারা দেখল দৈত্য সেই গাছটার নিচে পড়ে আছে, সারাশরীর তার শাদা মঞ্জরিতে ঢাকা।

জন্মদিন

এই সবে বারোতে পা দিল। আজই। আজ জন্মদিন। রাজকন্যার জন্মতিথি। তাই তো রোদ পড়েছে প্রাসাদের অলিন্দে-অলিন্দে। মিষ্টি রোদ। ফুটফুটে আলো। কী চমৎকার! আদৎ রাজকন্যা যে। একটুও ভেজাল নেই। একদম না। পুরোপুরি খাঁটি। স্পেনে এমন আর একজনও নেই। কেউ না। শুধু সে। শুধু দুঃখু একটাই। মোটে একবার আসে কেন জন্মদিন? সারা বছরে একবার কার না-আসে? গরিব দুঃখী ছোটলোক বড়লোক সবার বেলাতেই একদিন। আর সে রাজকুমারী। কেন তফাৎ হয় না?

তফাৎ জাঁকজমকে। তফাৎ আড়ম্বরে। সে ভারি রোশনাই। তাতে সবাই হার মানে। ছোট হয়ে যায় সকলে। উপেক্ষিত। সবাই উন্মুখ হয়ে থাকে তাই এই দিনটির আশায়। অধীর উন্মুখ। ব্যগ্র। কবে আসবে জন্মতিথি! রাজকন্যার জন্মদিন! এমনকি ফুল লতা পাতা গাছপালা পশুপাখি তারাও এই দিনটির জন্য অধীর। ভারি সুন্দর করে ফোটায় সেদিন গোলাপ নিজেকে। প্রজাপতি ওড়ে। ডানার কী বাহার! পাখি ডাকে। আহা কত সুর! কাঠবেড়ালি দৌড়ে-দৌড়ে ছোটে। আর ডালিমের শক্ত খোলস দাঁতের আঘাতে ঠুকঠুক করে ফাটায়। তখন ডালিমের ভেতরের রূপটা বেরিয়ে পড়ে। সে যা রূপ! রঙের যা বাহার! রঙ লাগে লেবুর গায়েও। কী সুন্দর। সোনার রঙের ফল, এমনি দিনে দেখায় ম্যাড়মেড়ে, আজ নতুন রঙে সাজে। নতুন রোদ মেখে নতুন হয়। ফোটে ম্যাগনোলিয়া। কী অপূর্ব! ভাঁজে ভাঁজে হাতির দাঁতের সাদা রঙ, মাঝে সোনার ঝলক, আর গন্ধ ছড়ায়। বাতাসে ভাসে সেই সুবাস।

আর রাজকুমারী?

সে ছুটোছুটি করে বেড়ায় বন্ধুদের সঙ্গে। খেলে। লুকোচুরি খেলা। বড় বড় পাথরের মূর্তি বাগানময়। আর ফুলের টব। তার আড়ালে গিয়ে লুকোয়। খুঁজে পায় না কেউ। বা পেলেও কেউ বলে না। আজ যে জন্মদিন তার। জন্মতিথি।

এ একটা অবাক দিন। নিয়মের অনেক ছাড়। পারে না রোজ সবার সঙ্গে খেলা করতে। রাজবাড়ির অনুমতি মেলে না। শুধু বাছাই-বাছাই বন্ধু, তারা বড়লোক। তাদের সঙ্গে খেলা। আজ সব ছাড়। আজ যে-কেউ আসতে পারে। যে-কেউ। সারাদিন হৈ-হৈ আর হুটোপাটি। দেখতে লাগে চমৎকার। কত শিশু। কত তাদের ভঙ্গি। কত বিচিত্র পোশাক। মাথায় সবার টুপি। এটা প্রথা। পরবেই সবাই। মেয়েরা পরে লম্বা ঝুলের গাউন। ছুটবার সময় গাউন তুলে নেয় হাঁটুর কাছে। তারপর ছোটে। নইলে পড়ে যাবে যে। শুধু রাজকন্যার সাজই আলাদা। সবার চেয়ে স্বতন্ত্র। গাউন তুলতে হয় না, দরজির এমনই কেরামতি। ধোঁয়া-রঙের জামা, তাতে সুতির ফুলতোলা হাতের কাজ, আর হাতার পটিতে গলার পটিতে বুকের পটিতে শুধু মুক্তো আর মুক্তো। সে যে কত মুক্তোর ছড়াছড়ি ! পায়ে থাকে হালকা রঙের চটি। একটু লাল ঘেঁষা। ভালোবাসে যে লালচে রঙ, ভালোবাসে যে মুক্তো ! মাথায় ভারি সুন্দর খোঁপা। খোঁপায় ফুল। সঙ্গে সোনার কাঁটা। সব মিলে লাগে যেন ফুটন্ত গোলাপ। ছুটে-ছুটে বেড়ায় যখন, মনে হয় ঘাসের উপর দিয়ে একটা ভারি সুন্দর গোলাপ ফুল ছুটে যাচ্ছে।

রাজা বসে আছেন জানলায়। দেশের রাজা। ভারি দুঃখী ভারি বিষণ্ন তার চোখ। মেয়েকে দেখছেন। ঠিক পেছনেই ভাই ডন পেড্রো। ভালোবাসেন না ভাইকে। তাঁর দু-চোখের বিষ। ঘেন্না। কাছে ঘুরঘুর করছে অমাত্য। সবাই চুপ। বিষাদ। বিষাদে থমথম করছে পরিবেশ। ছুটতে ছুটতে মাঝে মাঝে রাজকুমারী তাকায় জানালার দিকে, রাজার চোখে চোখ রেখে হাসে। ধূসর স্মৃতির মতো রাজার মনে পড়ে রানির মুখ। তার রানি নেই এখন। মৃত্যু দিয়েছে তাকে কোল। মেয়ের যখন ছ-মাস বয়েস তখন। পারেননি সেই দুঃখ ভুলতে। পারেননি। তাই কবর দেননি রানিকে। বদ্যি ডেকে এনে তার দেহে নানারকম লতাপাতার নির্যাস মাখিয়ে রেখে দিয়েছেন কাচের ঘরে। এই প্রাসাদেরই লাগোয়া নিকষ কালো মার্বেল পাথরের তৈরি একটা মস্ত গির্জায়। প্রতিমাসে একবার করে সেখানে যান। নিয়ম। পরনে কালোরঙের শোকের পোশাক, হাতে লণ্ঠন, হাঁটু গেড়ে বসেন সেই কাচঘরের সামনে। কাঁদেন। হাত বোলান কাচের গায়ে।—আমার রানি, আমার রানি ! বলতে বলতে আরো কান্না আসে চোখ ছাপিয়ে। আরো অশ্রু। এটা স্পেনের নিয়মের বাইরে। সব নিয়ম-বাঁধা এদেশে। রাজা কতটুকু কাঁদবেন, সেটাও হিসেব করে মেপে দেওয়া। তার বেশি হলেই মুশকিল। সবাই তাই নিয়ে কথা বলবে। আলোচনা হবে। হোক। এ-দিন রাজার সব হিসাবে গোলমাল হয়ে যায়। আজ সেই দিন। আজ আবার রাজা গির্জায় যাবেন।

আহা রে ! কত স্মৃতি দিয়ে ঘেরা আজকের এই দিন। কান্না পায়। বুকে যেন পাথর জমে। পাথর। সব মনে আছে স্পষ্ট। তার সাথে প্রথম দেখা। কী মিষ্টি তার মুখ। রাজার তখন মোটে পনেরো। মিষ্টি বয়েস। প্রথম দেখার সেই ভালো-লাগা। কদিন আর মন বসাতে পারেননি কাজে। তারপর প্রস্তাব। তারপর বিয়ে। সে কী ধুমধাম মাদ্রিদে। কী জৌলুস ! কেউ বাদ নেই। ভারি ফুর্তি সবার মনে, ভারি আহ্লাদ। রাজার বিয়ে বলে কথা ! সারা দেশ গমগম ঝমঝম হয়ে রইল কটা দিন।

আর সে কী ভালোবাসা ! কী আদর ! রাজা যেন রানি ছাড়া কিছুই আর জানেন না। যেন চোখের মণি। কত সুখ ! বিভোর হয়ে রইলেন তার রূপে। তার ভালোবাসায়। কিছুতে আর ভ্রুক্ষেপ নেই। না কাজকর্মে, না যুদ্ধে, না অন্য কোনো নিয়মে। মন আর বসে না। মন যেন দূরের কোনো রাজ্যে। বহুদূর। তখন মেয়ে হয়েছে। তার পরই মারা গেল রানি। সে যে কী

দুঃখ, কী যাতনা—তার যেন শেষ নেই। কদিন ঝিম মেরে বসে রইলেন রাজা। যেন ঘোর। এদিকে দুধের সেই মেয়ে। মোটে বয়েস তখন ছ-মাস। তাকে ছেড়ে দু-দণ্ড স্বস্তি পান না। ভাইয়ের ওপর ভার দেবেন, তাতে ভয়। যদি ভাই মেরে ফেলে! কানাঘুষোয় তো শুনেছেন, ভাই-ই নাকি খুন করেছে রানিকে। দুটো দস্তানা দিয়েছিল রানির হাতে পরার জন্যে। তাতে নাকি বিষ ছিল। সেই বিষ রক্তের সঙ্গে মিশে মারা গেছে রানি। সবাই তাই বলে। সবাই সেই ভেবে সান্ত্বনা পায়। রাজা পান না। শুধু জ্বালায় জ্বলেন অহর্নিশ। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায় বুকের ভেতরটা। মৃত্যুর পরে সারাদেশে তাই রাষ্ট্র করে দিলেন তিনবছর ধরে চলবে রাজকীয় শোক পালন। টানা তিনবছর। তিনবছর রইল দেশ ঝিম মেরে। সে যে কী অবস্থা! মন্ত্রীদের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ। পাত্র মিত্র অমাত্য কেউ ধারকাছ ঘেঁষতে সাহস পায় না। সব চুপ। যেন নির্বাসনে আছেন রাজা। সকলের চোখের আড়ালে। তখন সম্রাট পাঠালেন এক দূত। তাঁরই ভাইঝি, বোহেমিয়ার রাজকুমারী—করবেন কি রাজা তাকে বিয়ে? রাজা বললেন দূতকে—যাও গিয়ে বল, সম্রাট যেন এমন অনুরোধ আর না করেন। বেদনার সাথে যার হয়েছে পরিণয় তার আবার নতুন করে বিয়ের কী দরকার! শুনে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন সম্রাট। খেসারত হিসেবে রাজার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন রাজ্যের এক মস্তবড় অংশ।

তাতে দুঃখ নেই। যাক রাজ্য, যাক সব—রাজার ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। শুধু চিন্তা এখন মেয়েকে নিয়ে। ঐ তো তাকাল, হাসল, ঘাড় কাত হল ডানদিকে। সব চেনা। এ-ভঙ্গি রাজার হৃদয়ে মিশে আছে। হুবহু এক। হু-ব-হু। ওর মা এইভাবেই হাসত। ঠিক এইভাবে। হাসতে হাসতে ঘাড় কাত করত ডাইনে। হাত দিত সামনে ছড়িয়ে। তার রানি। তার প্রিয় রানি। এত মিলও হয়! সব মনে পড়ছে নতুন করে। সেই ছবি। সেই চিরপরিচিত মুখ। আর তীব্র একটা গন্ধ। রানির দেহে এমনই গন্ধের কী যেন একটা ভেষজ মাখা হয়েছিল মৃত্যুর পর। যেন ভারি হয়ে আছে বাতাস সেই গন্ধে। ভয় করছে। নাকি নিছক কল্পনা? আর পারছেন না মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে। দৃষ্টি বারেবারে ঝাপসা লাগছে।

তখন দু-হাতে মুখ ঢাকলেন। জানলা বন্ধ হল।

খেলতে খেলতে ফের তাকাল মেয়ে। আশ্চর্য। বাবা তো নেই! কী যে এত রাজকাজ! বুঝি না বাপু। আজ-না আমার জন্মদিন! আজ-না বাবার সবকিছু থেকে ছুটি নেবার কথা। নাকি গেছেন আবার সেই গির্জায়? নিকষ কালো পাথর। যেন গুহা একটা। তাতে দিন নেই রাত নেই জ্বলে মোমবাতি। নেভা বারণ। সেখানে ঢুকতে পারে সবাই। শুধু মেয়ের মানা। মানা তো মানা—যেতে আমার ভারি বয়ে গেছে! থাকো গিয়ে তুমি ওখানে। আমি কাকুর সাথে ষাঁড়ের লড়াই দেখতে যাব। ঐ তো মঞ্চ! ঐ তো কত লোক হাজির। আমি গেলেই শুরু হবে। আর কী ভালো কাকু আমার! ঠিক হাজির। ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। চল তো কাকু—

কাকু হাত ধরল। রাজার সেই ভাই—ডন পেড্রো। ধীরে ধীরে মঞ্চের দিকে এগোল। মস্ত শামিয়ানা। সারাদেশ ভেঙে এসেছে মানুষ। কত মানুষ! একটা অংশ ভারি সুন্দর করে সাজানো। সেখানে সিংহাসন। মেয়ে বসবে সেখানে। আশেপাশে সঙ্গীসাথীর দল। ...চল না কাকু। এক্ষুনি শুরু হবে। পা চালাও-না আরেকটু।

চলল শোভাযাত্রা। সার বেঁধে মস্ত একটা দল। পুরোভাগে রাজকুমারী। ঐ তো মঞ্চ। কী বিরাট শামিয়ানা! কী অপূর্ব রোশনাই। একাংশ উঁচু করা। যেন একটা বেদি। তার উপর হাতির দাঁতের মীনে-করা চমৎকার এক সিংহাসন। রাজকুমারীর পেছনে-পেছনে চলেছে

সঙ্গীসাথীর দল। সবশেষে ডন পেড্রো আর প্রধান অমাত্য। এটাই নিয়ম এ-দেশের। আজ অব্দি প্রতিটি জন্মদিনে এই রীতি মেনেই সবাই মঞ্চের দিকে গেছে।

বেদির নিচেটাতে দাঁড়িয়ে আছে অতি সুদৃশ্য পোশাক-পরা একদল কিশোর। নুয়েভার যুবরাজও আছে সেই দলে। তার বয়েস এখন চোদ্দ। এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল রাজকুমারীকে। দেখাদেখি সবাই। যুবরাজ হাত ধরে রাজকুমারীকে বসাল সিংহাসনে। সঙ্গীরা চারপাশে গোল হয়ে বসল। তারপর ফিসফিস ফিসফিস—কানে কানে সে যে কত কথা! ওরা কি আর নিয়ম-টিয়মের ধার ধারে! ডন পেড্রো দাঁড়িয়ে আছে এককোণে, পাশে অমাত্য। মুখে হাসির ঝিলিক। ভালো লাগছে সব। খুব সুন্দর। তাই হাসছে। হাসছে ঐ বুড়িটাও। মুখে বয়সের রেখা। ভারি খিটখিটে মেজাজ। জাঁদরেল জমিদারনি। সবসময় রাগ। সে-ও রকম-সকম দেখে না-হেসে পারছে না।

শুরু হল লড়াই। সত্যি লড়াই নয়। সাজানো। তবু ভারি সুন্দর। আসলের চেয়েও ভালো। আসল লড়াই দেখেছিল মেয়ে। মোটে একবার। তখন পার্মা জেলার জমিদার এসেছিল এ-রাজ্যে বেড়াতে। তারই সম্মানে লড়াই। আর এ-লড়াই রাজকন্যের সম্মানে। কাগজ দিয়ে বানিয়েছে ঘোড়া। তার মধ্যে মানুষ। ছুটছে তার পিঠে চড়ে। ঘুরছে। তখন আরেকজন ঘোড়সওয়ার রাংতার বর্শা ঢুকিয়ে দিল সেই ঘোড়ার পেটে। পড়ল ঘোড়া উপুড় হয়ে। কী চমৎকার! যেন সত্যিসত্যি মারা গেল। তেমনি সাজানো একটা ষাঁড়। জ্যান্ত নয়। তার সামনে লাল কাপড় নাড়ছে কয়েকজন যোদ্ধা। ক্ষুদে যোদ্ধা। হাবভাব পুরোদস্তুর বড়দের মতো। আর ষাঁড়টাকেও লাগছে চমৎকার। ছাল নিয়েছে ষাঁড়ের, তাতে মোম মাখানো, ভেতরে খড়। তার মাঝে একজন মানুষ। কে বলবে মানুষ লুকিয়ে আছে এর মধ্যে? কে বলবে এটা জ্যান্ত নয়, নকল? আর কী ছুট! ছুটে বেড়াচ্ছে সারা মাঠে। শিং নাড়িয়ে তেড়ে আসছে। যোদ্ধা পিছু হটছে সঙ্গে সঙ্গে। সে কী লড়াই!—সাবাস সাবাস! চারদিক থেকে ধ্বনি উঠল। রুমাল নড়ল কত। যেন সত্যি লড়াই। কত ঘোড়া পড়ল মুখ থুবড়ে। কত ঘোড়সওয়ার অক্কা পেল। তারপর সবশেষে কাবু হল ষাঁড়। নুয়েভার যুবরাজের পায়ের গোড়ায় পড়ল হাঁটু ভেঙে। রাজকন্যের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল যুবরাজ। কোমর থেকে খুলে নিল কাঠের তরোয়াল। বসিয়ে দিল তার পেটে। আমূল। তারপর এককোপে গলাটা কেটে ফেলল। ঝলকে ঝলকে তখন রক্ত বেরুবার কথা। রক্ত নয়, বেরিয়ে এল মাদ্রিদের ফরাসি রাজদূতের বড় ছেলে। হাসতে হাসতে রাজকন্যের দিকে তাকিয়ে অভিবাদন জানাল।

সে কী হাততালি। কী হুল্লোড়! দর্শক যেন ফেটে পড়ছে উত্তেজনায়। রুমাল উড়ল। এরই ফাঁকে একদল কাজের লোক এসে পরিষ্কার করে দিয়ে গেল লড়াইয়ের ঘেরা জায়গাটা। টানতে টানতে নিয়ে গেল কাগজের ঘোড়া। কাপড় চোপড় তরোয়াল বর্শা সব নিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের বিরতি। এল পুতুল-নাচিয়ের দল। অদূরে ছোট একটি মঞ্চ আগে থেকেই প্রস্তুত। পর্দা গেল খুলে। শুরু হল নাচ।

জাদু আছে যেন অদৃশ্য হাতের আঙুলে। অদৃশ্য দড়ির সে কী ছন্দ! হাসছে পুতুল, কথা বলছে, কাঁদছে, মারপিট করছে। অপূর্ব। যেন জীবন্ত মানুষ। আর দুঃখের কাহিনী তো। বিয়োগান্তক পরিণতি। শেষটা এত করুণ, চোখে জল এসে গেল মেয়ের। রুমাল দিয়ে মুছল। শুধু কি সে? দেখাদেখি কতজন যে কাঁদল তার আর ইয়ত্তা নেই। তখন মেঠাই বিলি হল সবার মধ্যে। সব আগে থেকে আনানো। ডন পেড্রোর চতুর্দিকে নজর। অমাত্যের

হাতেও দিল একটা মিষ্টি। তারও চোখে জল। বলল, আর বলবেন না। এমন যে হতে পারে ভাবিনি। মোম দিয়ে তৈরি জঙ্গল, মনে হল মোমের নয়, সত্যি সত্যি। সুতো দিয়েও এত ভেল্কি হয়! জানতাম না।

তারপর এল এক জাদুকর। আফ্রিকার মানুষ। কত-যে কৌশল! একটা বাক্স এনে রাখল মঞ্চের মাঝখানে। সেটা লাল কাপড় দিয়ে জড়ানো। তারপর মাথার টুপির ভাঁজ থেকে বের করল একটা বাঁশি। অদ্ভুত দেখতে। তাই বাজাল। অমনি নড়ে উঠল কাপড়টা। যেন নাচছে ভেতরে কেউ তালে তালে। বাঁশির আওয়াজ ক্রমশ আরো তীক্ষ্ণ হল। তীব্র হল নাচ। নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল দুটো সাপ। একটার রঙ সবুজ, আরেকটা সোনালি। সিধে হয়ে দাঁড়াল। এক্কেবারে সিধে। শুধু লেজের মাথাটুকুর ওপর ভর। দুলছে। যেন জলে ফোটা পদ্মফুল। হাওয়ায় যেমন দোলে। জিভ বের করছে। সারা গায়ে চিত্র-বিচিত্র ফোঁটা। ভয় করছে সব্বার। যদি একটা-কিছু অঘটন ঘটে। যদি আচমকা ছোবল মারে জাদুকরের গায়ে! ওমা, কী অবাক কাণ্ড! সাপ দুটো দেখতে-না-দেখতে হয়ে গেল দুটো লেবুগাছ। তাতে ফুল ফুটল, ফল এল। সব চোখের সামনে। দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সবাই। তখন টুপি নাড়ল জাদুকর। এগিয়ে এসে তালপাতার একটা পাখা চেয়ে নিল একজনের কাছ থেকে। ওমা, কী অদ্ভুত! কোথায় পাখা! এ তো দেখি একটা নীলরঙের পাখি। কী তার ডানার বাহার! কী তার ওড়ার ঘটা! সারা মাঠ চক্কর খেয়ে উড়ে এসে বসল জাদুকরের হাতে। চোখের নিমেষে সেটা হয়ে গেল আবার সেই পাখা।

ফের হাততালি। ফের উচ্ছ্বাস। হাসতে হাসতে বিদায় নিল জাদুকর। তখন এল খুদে নাচিয়ের দল। এরা গির্জায় থাকে। গির্জারই পোষ্য। নাচ-গানে ভারি ওস্তাদ। খুব সুনাম। প্রতি বছর মে মাসে গির্জায় একবার করে সম্মেলন বসে। সেখানে ওরা নাচ দেখায়। কোনোদিন দেখতে যায়নি মেয়ে। যাওয়া বারণ। পাদ্রি নাকি পাগল। বদ্ধ উন্মাদ যাকে বলে। একবার এক রাজপুত্রকে নাকি বিষ-মেশানো জল খাইয়ে মারতে গিয়েছিল। হত্যার চেষ্টা। তবু তাড়ানো যায়নি। পাদ্রির ওপর কথা বলবে এমন সাহস কার! তাই নাচ দেখাও হয়নি। বারণ যে! শুধু প্রশংসা শুনেছে। নাকি দারুণ নাচে ওরা। সেই নাচই দেখল। অপূর্ব! যেমন পোশাকের বাহার, তেমনি নাচের সুষমা। পুরনোদিনের ঝোলাজোব্বার মতো পোশাক সবার গায়ে, মাথায় মস্ত টুপি। তাতে তিনকোণে তিনটে উটপাখির পালক। আর মাথায় লম্বা লম্বা চুল। টুপি ছাড়িয়ে এসে পড়েছে পিঠের উপর। তা বলে ছ্যাবলামির নাম গন্ধ নেই। খুব রাশভারি হাবভাব। আর নাচ যেন মন্থরগতিতে-চলা ছবির মতো। পিঠ নুইয়ে যখন অভিবাদন করছে তখন আগাগোড়া শরীরটা পড়ছে নিচু হয়ে। যেন ঝড়ে-ভাঙা কোনো গাছ। সেইভাবেই শেষ হল। টুপি তুলে সম্মান জানাল রাজকন্যেকে। এত মুগ্ধ হয়েছে মেয়ে—বলল, কালই মস্ত একটা মোমবাতি পাঠিয়ে দেবে গির্জায়। নাগাড়ে সাতদিন ধরে জ্বলবে।

এরপর এল মিশরের একটা দল। হাতে তারের বাজনা। গোল হয়ে পা ছড়িয়ে বসল সবাই। গান শোনাল। তালে তালে দোলাল শরীর। সে ভারি মনোরম। অপূর্ব সেই সুর। তার দোলা। বড় করুণ সেই সুর। হবে না করুণ! কদিন আগে ফাঁসি গেছে তাদেরই দলের দু-জন। নাকি সর্বসমক্ষে ডাকিনী-বিদ্যা দেখাচ্ছিল। এটা অপরাধ। তাই তো ভয়ে ভয়ে গাইছে। আর দেখছে রাজকন্যাকে। কী মিষ্টি দেখতে! এর কাছ থেকে আপাতত ভয়ের কোনো আশঙ্কা নেই। এত নিষ্ঠুর এমন সুন্দর মেয়ে কিছুতেই হতে পারে না। একদম না। আর নতুন করে সাজা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। গাইতে গাইতে মাথা নাড়ছে। অদ্ভুত সেই ভাষা। যেন মায়াবী কোনো সুর। ঘুম আসছে সবার চোখে। ঘুমপাড়ানি গান। অবাক কাণ্ড, কই এতক্ষণ তো ঘুম পাচ্ছিল না। সুর গেল পালটে। অমনি আসছে ঘুম। আহ্ ঘুম! আয় ঘুম আয়।...

ঘোর যেন নিমেষে কেটে গেল। চিৎকার করে উঠেছে ডন পেড্রো। তলোয়ারে হাত। চোখ জ্বলছে ভাঁটার মতো। অমনি উঠে পড়ল গায়কের দল। পালটে গেল সুর। নতুন সুর। খুব তেজ। ভালোবাসার গান। অন্যরকম এর মিষ্টতা। আচ্ছন্ন ভাবটা আর নেই। ডন পেড্রো একইভাবে তাকিয়ে আছে। সারা মুখে গনগনে রাগ। ইশারা করল। মাটিতে সটান শুয়ে পড়ল গায়কের দল। স্থির। নড়াচড়া বন্ধ। শুধু তারের বাদ্যযন্ত্রে ঘা লেগেছে পড়বার সময়। তারই রেশ ভাসছে বাতাসে। তা ছাড়া সব চুপ। কারো মুখে কথা নেই। সেই অবস্থাতেই আবার ওরা উঠে দাঁড়াল। আবার পড়ল ভুঁয়ে। মার্জনা চাইছে শ্রোতৃবৃন্দের কাছে। অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইছে। তারপর একসময় বিদায় নিল।

ঢুকল দুটো হনুমান–কাঁধে একজন। সঙ্গে একটা ভালুক। সে এক নতুন খেলা। নাচ দেখাল ভালুক। প্রভুর আদেশে জ্বর আনল। বিয়ের সাজ পরল। হনুমান করল ঝগড়া। হাততালি দিল। একজন নাচল চারদিকে ঘুরে–ঘুরে। ভালুকের ঘাড়ে চেপে আরেকজন ডিগবাজি খেল। সে ভারি মজা। হাসতে হাসতে সবার পেটে খিল লাগার দাখিল।

সবশেষে এল বামন। নাচ দেখাবে। এত মজা এ–তাবৎ কেউ পায়নি। চেহারা দেখলেই পেটের মধ্যে গুড়গুড়িয়ে ওঠে হাসি। বাঁকা ধনুকের মতো দুখানা পা, মাথাটা ইয়া বড়, তাই আবার নাড়ছে ডাইনে থেকে বাঁয়ে। কী বিকট যে লাগছে। বিকটের মধ্যেই থাকে হাসির খোরাক। তাই হাসছে সবাই মুহুর্মুহু। রাজকুমারী তো হাসতে হাসতে যাকে বলে ঢলে পড়ার দাখিল। এতটা কি ঠিক? কানের কাছে একজন ফিসফিস করে সাবধান করে দিল। নিয়ম নেই যে! স্পেনে কোনোদিন কোনো রাজকুমারী আজ অব্দি মজার দৃশ্য দেখে এতখানি হাসে নি। একদম না। একটু যেন সতর্ক হয়। আর সতর্ক! বামন সতর্ক হবার সময় দিলে তো। উলটে–পালটে হাত–পা ছড়িয়ে সে যা নাচের ঘটা! তাই হাসি। তাই ঢলে পড়ছে এ ওর গায়ে। সবাই। একজনও বাদ নেই আর। মোটে তো কালই সন্ধান পাওয়া গেল এই বিচিত্র–দর্শন মানুষটার। আগে কোনোদিন কেউ দেখেনি। নাকি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছুটছিল। তখন শিকারে গেছে দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি। সে আবার শোলাগাছের বন। আরেকটু হলে তীর মারত। ভাগ্যি ভালো তাই মরেনি। ধরে নিয়ে এসেছে তাকে শহরে, সেখান থেকে সোজা রাজপ্রাসাদ। কেউ আগে তার কথা জানায়নি। চমক দেবার মতলব আর কী। অনুষ্ঠানের দিন তুলবে সবশেষে মঞ্চে, সবাইকে চমকে দেবে। বাবাটারও হদিশ মিলেছে। কাঠকয়লা বিক্রি করে। ভারি মুশকিলে পড়েছিল ছেলেকে নিয়ে। কোনো কাজে লাগে না। পাঁচজনের মধ্যে বেরুতে পারে না—তবু যাহোক, রাজবাড়িতে ঠাঁই পেল, এ কি হাজার চেষ্টা করলেও হয়! ভাগ্যি ভালো তাই জুটে গেল কাজ। হাসাবে সবাইকে, নাচ দেখাবে, বিনিময়ে জুটবে কটা পয়সা। মজুরি আর কী। বাবার তবু খাটুনি বাঁচবে। আর পারা যায় না বাপু কাঠকয়লা বিক্রি করে সংসার চালাতে। তো নাচছে তাই। জীবনে এ–রকম নাচ এই প্রথম। তা–ও খোদ রাজকুমারীর সামনে। বোঝে না তো নিজেকে দেখতে কত কদাকার। লোকে তাই হাবভাব দেখে হাসে। তাই যত হাসছে সবাই, উৎসাহ বাড়ছে, ঘুরে–ঘুরে নাচছে তত উদ্ভট–উদ্ভট ভঙ্গিতে। হাসির জবাবে নিজেও হাসে। ভাবে কী চমৎকার–না দেখতে আমায়। সবচেয়ে ভালো লাগছে রাজকুমারীকে। এই–যে বসে আছে এত লোক, এত মেয়ে—ওর মতো সুন্দর আর কেউ নেই। কেউ না। তাই স্থিরদৃষ্টিতে তারই দিকে তাকিয়ে আছে। সে যা নজর! অবাক মুগ্ধ সেই চোখ। তখন কী খেয়াল গেল কন্যের। চুল থেকে খুলে নিল শাদা একটা গোলাপ, ছুড়ে দিল তার দিকে। মজা আর কী। তা ও সেই মজা বুঝলে তো! ফুলটা আলগোছে তুলে চুমু খেল। বুকের কাছে ধরল। হাঁটু গেড়ে বসল মাটিতে। রাজকুমারীর

চোখে চোখ। মুখে হাসি। আকর্ণ বিস্তৃত। বড় খুশি লাগছে। খুশির চোখ নিয়ে একইভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তাই-না দেখে কন্যের সে কী ফুর্তি, কী হাসি! হাসি যেন আর থামে না। এমনকি মঞ্চ ছেড়ে চলে গেল বামন, তখনো। তারপর বায়না।—আনো না কাকু ওকে, আরেকবার নাচ দেখাতে বল না! সামলানো দায়। তখন মহামাত্য বলল, রোদ চড়ে যাচ্ছে তো, তাই এখন আর এই খোলা জায়গায় বসে নাচ দেখা যাবে না। তাছাড়া খিদেও তো পেয়েছে সবার। খুব খিদে। এত হাসির পর খিদে না-পেয়ে যায়? টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। জন্মদিনের কেকও তৈরি। শুধু রাজকুমারী গিয়ে নিজের হাতে একবার কেটে দিলেই হয়। সবাই অমনি বসে পড়বে। কুচোকাচার সব দলবল। তারপর বিশ্রাম-টিশ্রাম নেওয়ার পর নয় আরেকবার নাচের আয়োজন করা যাবে।

তাতে রাজি হল রাজকুমারী। উঠল। দলবলও উঠল। সামনে নুয়েভার যুবরাজ। খুব প্রশংসা করল তাকে। তারপর সবাই মিলে রাজার বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

ঠিক তখনই আরেক প্রান্তে বয়ে চলেছে খুশির ঝড়।

ঝড় নয় তুফান। বুকের মধ্যে তোলপাড়। শুধু পুলকের শোঁ-শোঁ ঢেউ। শুনেছে বামন, তার নাচ আরেকবার দেখতে চেয়েছে রাজকুমারী। আরো একবার! সে যা আনন্দ। আনন্দে যেন দিশেহারা। বুক কাঁপছে থরোথরো। মন লাগছে উড়ু উড়ু। আর কে পায়। অমনি শোনামাত্র মনের খুশিতে ছুটে চলে গেল বাগানে। এক ছুট। হাতে সেই শ্বেত গোলাপ। তাতে চুমু খেল। ঘষল গালে। লাফ দিল। নাচল। সে খুব বিকট ভঙ্গি। দেখে রি-রি করতে লাগল সারা বাগান।

ফুলের তো ভারি রাগ। এই-যে চারপাশে ফুটে আছে রাশিরাশি ফুল।—এটা মানুষ না জন্তু! কী করে সাহস পায় এমন সুন্দর বাগানে ঢুকতে! দ্যাখ্ দ্যাখ্। কেমন হাত তুলছে মাথার ওপর, পা দাপাচ্ছে! ওকে দূর করে তাড়িয়ে দে এখান থেকে।

জুঁই বলল, ও এত কুচ্ছিত, ওর অধিকার নেই আমাদের বাগানে ঢুকবার।

লিলি বলল, দে না ওকে আফিম-ফুলের রস খাইয়ে। ও হাজার বছর নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমোক।

ফণিমনসা বলল, তাই ভালো। ও একটা আতঙ্ক।

—আতঙ্ক তো একশোবার। লিলি রাগে গমগম করতে করতে মুখ ঝামটাল, চেহারাটা দ্যাখ একবার। না আছে ঢক, না কোনো পদের। পা দুটো বাঁকা, তার ওপর মাথাটা মস্তবড় কুমড়োর মতো।

—আসুক-না আমার কাছে। ফণিমনসা দাঁতে দাঁত পিষল। গা আমার নিশপিশ করছে। দেব অমনি কাঁটা বিঁধিয়ে। তখন মালুম পাবে।

শ্বেতগোলাপ বলল, সবচেয়ে লজ্জা লাগছে আমাদের। হাতে দ্যাখ কী সুন্দর ফুল। সকালবেলা কত কষ্টে ফুটিয়ে দিলাম রাজকুমারীকে, ও ঠিক তাল বুঝে হাতিয়ে নিল। চোর ওটা। আস্ত চোর। আমাদের বাগানে চোরের কোনো ঠাঁই নেই।

এমনকি ছোট্ট এইটুকুনি টুকুনি ঘাসফুল, দেমাক করার মতো কিছুই তাদের নেই, গরিব বলে সবাই বলে নিচু জাত—শুনে তাদেরও যেন বিরক্তির একশেষ।—এ কোন হতভাগা এল বাগানে! নেচেকুঁদে একসা করছে। জানে না এতটুকু ভব্যতা সভ্যতা!

—এমনকি আদব কায়দাটুকুও শেখেনি!

—শিখবে কী করে! শিখবার মতো অবস্থা হলে তো।

অর্থাৎ এই-যে ওর সাদামাটা হাবভাব, আনন্দ প্রকাশের এই-যে সহজ অভিব্যক্তি—এটাই ওর মস্ত বড় ত্রুটি। সবাই এইভাবেই ব্যাপারটাকে দেখল। এ-বাগানে যারা আসে তারাই সভ্য, মার্জিত, সুন্দর। এ হল রাজার বাগান। আর ও কিনা কুচ্ছিত। ছিরি যার এমন, সে মরতে এ বাগানে ঢোকে কেন? এত বড় বুকের পাটা তার হয় কীভাবে?

মোটমাট ভারি রেগে গেল সবাই বামনের হাবভাব দেখে।

রোদ-ঘড়িটাও রাগল।

বহুদিনের পুরনো ঘড়ি। বলতে গেলে থুত্থুড়ে বুড়ো। একপাশে পড়ে আছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সেটা একলা ওরই সাম্রাজ্য। দেখেছে তো অনেক কিছু এতদিন। দেখে জানে। তবু মুখে বলে না কিছু। শুধু সময় দেয় ঠিক ঠিক। যাকে বলে কাঁটায়-কাঁটায় সময়। তো মানুষটাকে দেখে তারও কপাল-টপাল কুঁচকে, যাকে বলে তিড়িবিড়ি রাগ। দু-মিনিট তো সময় ভুল করে কটমট করে তাকিয়ে রইল হতভাগার মুখের দিকে। মরণ আর কী! ভাবভঙ্গি দ্যাখো! করছে এমন, যেন ও-ই দুনিয়ার বাদশা! পোড়ারমুখো! কপাল না-পুড়লে কেউ এমন করে লাফায়! ময়ূরকে বলল, দ্যাখ্ ময়ূর, দুনিয়ার কতগুলো নিয়ম আছে। তাই মেনেই দিনরাত হয়, সূর্য ডোবে। সেই নিয়মের জোরেই রাজার ছেলে রাজা আর কাঠকুড়ুনির ছেলে হয় কাঠকুড়ুনি। এ পোড়ারমুখো কি কিছুই জানে না!

ময়ূর গলা দুলিয়ে বলল, কিছুই না, কিছুই না।

বলে এমন এক আওয়াজ ছাড়ল, ফোয়ারার জলে লালমাছ নীলমাছ উঠল চমকে। আর কাউকে না-পেয়ে পাথরের তিমিটাকেই বলল, কী ব্যাপার বল তো? এত চেঁচামেচি কিসের?

তিমি চুপ করে পলকহীন পাথরের চোখে তাদের দিকে তাকিয়েই রইল।

শুধু পাখিরা যা একটু আলাদা। তফাৎ সবার চেয়ে। হাসল না, টিটকিরি দিল না, আড়েঠাড়ে বলল না একটাও কু-কথা। উলটে খুশি হল খুব। মানুষটাকে ওরা ভালোবাসে।

বাসবেই তো। কুচ্ছিত তাতে হয়েছে কী? কে না কুচ্ছিত? এই তো দোয়েল পাখি। শুধু লেজেরই যা বাহার। অথচ শিস দিয়ে গান করে যখন, সবাই মুগ্ধ হয়ে শোনে। রাতের বেলা চাঁদ অব্দি নেমে আসে আকাশ থেকে নিচে, আড় হয়ে থমকে দাঁড়ায়। একমনে শোনে দোয়েলের গান। কুচ্ছিত তাতে আসে যায় কী! তাছাড়া এই মানুষটাই-না কত ভালোবাসে তাদের। সেই সেবার পড়ল হাড়-কাঁপানো শীত। মাটি শুকিয়ে ফুটিফাটা। গাছে নেই একটিও পাতা। নেই একটু জল। এদিকে নেকড়ে ঘোরে সারারাত সারাদিন খাদ্যের খোঁজে। তারা ভয়ে গাছ থেকে নামতে পারে না। পারে না পাতার আড়ালে লুকোতে। সেইসময় সেই দুঃখ-দুর্দশার দিনে বাঁচিয়ে রাখত তাদের এই বামন। এই কালো কুচ্ছিত বিকটদর্শন মানুষটা। নিজের পোড়া রুটি থেকে ভাগ দিত তাদের। নেকড়ে তাড়াত। জল এনে রেখে দিত কলসি ভরে। কই, তখন কোনো রাজবাড়ির সুন্দর মানুষের তো দেখা মেলেনি।

তাই তাকে দেখে সবাই বড় খুশি। গান শোনাল মাথার উপর ঘুরে-ঘুরে। ডানার আদর বুলিয়ে দিল গালে। উড়ে এসে বসল কাঁধের উপর। তাইতে কী ফুর্তি মানুষটার! দেখাল তাদের হাতের শ্বেতগোলাপ। তার গন্ধ শোঁকাল। কথা বলল কত। যেন প্রাণের বন্ধু সবাই। রাজকন্যে—যে নিজের হাতে ছুড়ে দিয়েছে ফুল, কথার ফাঁকে ফাঁকে সেটাও জানিয়ে দিল।

হায়রে, সে যে মানুষের ভাষা। পাখি তা বুঝবে কেমন করে। তবে ঐ-যে বলে মনের শান্তি, তাই খানিকটা হল। পাখিরাও ঘাড় এলিয়ে ঠোঁট দুলিয়ে চোখ বড় বড় করে ভাব দেখাল এমন—যেন বুঝেছে সব। যেন কিচ্ছুটি বাদ নেই। এবং যা-যা বলল সে, সবই তাদের কাছে নতুন। আগে এমন কখনো কেউ শোনেনি। তাই রীতিমতো অবাক হবার ভান করল।

এল পালে পালে কাঠবেড়ালি। সে যে কত! ভালো লেগেছে যে ওকে খুব। ওর এই হাবভাব, ছুটোছুটি, এমনকি এই-যে এখন ক্লান্ত শ্রান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে গা এলিয়ে শুয়ে পড়েছে ঘাসের উপর, তা দেখেও সে-যে কী খুশি ওরা! গায়ের উপর উঠে, আশপাশ দিয়ে ঘুরে লম্ফঝম্প খেয়ে কত খেলা যে খেলল! বামন একটুও রাগল না। বরং তারও আনন্দ। শুয়ে চুপচাপ দেখল ওদের খেলা। তখন কাঠবেড়ালি-দলনেতা ঘোষণা করল : শোনো তোমরা, সবাই কাঠবেড়ালির মতো সুন্দর নয় এটা হল গিয়ে সত্যি কথা। কিন্তু সুন্দর অন্যরকমও আছে। এ হল তাই। এর মনটা ভালো। সকলে একে অবজ্ঞা করে, কিন্তু আমরা করি না। করব না কোনোদিন। অবজ্ঞা করা অন্যায়।

বাস্তবিক কাঠবেড়ালি জাতটা অনেকটা দার্শনিকগোছের। ভেবেচিন্তে কথা বলে। মাঝে মাঝে দারুণ ছুটোছুটি করে বটে, তবে ওরই মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবেও অনেককিছু। বিশেষ করে বর্ষাকালে। তখন তো বাইরে যাতায়াত প্রায় বন্ধ। আর সেইসব ভাবনা জুড়ে-জুড়ে এক-একটা কথা বানায়।

শুধু মজল না কিছুতে ফুলের দল। রাগ আর কিছুতে যায় না। রাগে যেন গমগম। তার ওপর পাখিরা করছে ওরকম আদিখ্যেতা—আদিখ্যেতা বৈকি। ওদের কি নীতিটিতি বলে কিছু আছে? ঘুরে-ঘুরে করছে দেখো কাণ্ড! দেখলে যেন হাড়পিত্তি অব্দি জ্বলে যায়। বিবেচক যারা তারা হবে ধীরস্থির। এই যেমন আমরা—এই চারপাশের রাশিরাশি ফুল। বড়সড় বাতাস না এলে আমরা কি অত নড়াচড়া করি? দুলি? আর ওরা সেই থেকে সমানে পাক খাচ্ছে। ঘুরছে উড়ছে মাথার উপর। কেন রে বাপু! এমনকি শুনছে বসে বসে ওর কথা, তাতেও ঠোঁট নাড়ছে ডানা ঝাপটাচ্ছে চোখ ঘোরাচ্ছে। বুদ্ধি থাকলে কি কেউ এমন করে? তেমনি হাড়হাভাতে অলপ্পেয়ে ঐ কাঠবেড়ালির দল। ঝাড়ু মার ওদের মুখে। শুয়ে রয়েছে মানুষটা, পালে পালে এসে নেচেকুঁদে ওকে আয়েশ দিচ্ছে। কেনরে বাপু, নাচবার খেলবার ছুটোছুটি করবার আর কি কোনো জায়গা নেই! এখানে এসে জড়ো হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই?

একবুক রাগ নিয়ে খরখরে রোদ্দুরে তাই গনগনে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল তারা কাঠবেড়ালি আর পাখির দলের দিকে।

রাগ কমল বামন যখন আরো অনেকক্ষণ বিশ্রামের পর গা-হাত-পা ঝাড়া দিয়ে উঠল। ধীর পায়ে এগোল মঞ্চের দিকে।

গোলাপ বলল, বাপরে বাপ, যেন আপদ বিদেয় হল এতক্ষণে! ওকে উচিত হল ঘরে তালা আটকে বন্ধ করে রাখা। জন্তুকে যেমন আটকে রাখে। পা বাঁকা, মাথা বড়—ও কি মানুষ!

মানুষ বলেই বামন কিছু বুঝতে পারল না। গোলাপের এত রাগ—জন্তু হলে নিশ্চয়ই সে ফুলের ভাষা গাছের ভাষা পাখির ভাষা জানতে পারত। পারল না কিছু বুঝতে। শুধু বুঝল পাখিরা তার বন্ধু আর কাঠবেড়ালির দল তার আপনজন। ফুল তো আর বন্ধু হতে পারে না—বাগানময় এই এত ফুল—ওরা সুন্দর। সুন্দর হয়ে ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। তবে আর যাই হোক, রাজকুমারীর মতো সুন্দর কেউ নয়। কেউ না। এমনকি শাদা গোলাপটা অব্দি না। ভালো লাগছে গোলাপের দিকে তাকাতে, তার সুঘ্রাণ বুক ভরে টেনে নিতে, কিন্তু সে নিছকই ভালো লাগা। তাতে ভালোবাসা নেই। মোটেই না। ভালোবাসার মানুষ শুধু একজন—রাজকুমারী। ইস্, যদি আমাকেও ডেকে নিয়ে যেত ওদের সঙ্গে! রাজপ্রাসাদের মধ্যে! যদি একটিবার সুযোগ পেতাম! নির্ঘাৎ খাতির করে ডানপাশে বসাত। বাঁ দিকে নয়। বাঁ দিকে বসায় বন্ধুকে। আর ডানদিকে বসায় একান্ত প্রিয় মানুষকে। বসিয়ে গল্প করত। কথা বলত। খেলা করত। নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে। হাসত। আদর করত। বিনিময়ে সে দেখাত নাচ।

মানুষ সবকিছু শিখিয়ে দেয়। কিছু কি গোপন রাখে! আরো জানে কত কী। ফড়িং ধরে রেখে দিতে পারে একটুকরো বাঁশের মধ্যে, তারপর বাঁশে ছোট্ট একটা ফুটো করবে। সেই ফুটোয় কান লাগালে শোনা যাবে কত গান কত সুর। পারে পাখির ডাক ডাকতে। সে যে-কোনো পাখি। কাক বল কাক, কোকিল বল কোকিল, টিয়া বল টিয়া—সব। এমন অদ্ভুতভাবে ডাকবে, শুনে সত্যি পাখি অব্দি চমকে যাবে। চেনে সব জন্তুর পায়ের ছাপ। ছাপ দেখে বলে দিতে পারে জন্তুটার বয়েস কত, সে কী জাতের, কোথায় কোন্ দিকে গেল, কেন গেল—সব। নাচ জানে অনেক রকমের। বনের পশুপাখি যতরকম নাচে, সব পারে। নাম তার নানান রকম। যেমন বরফ নাচ, রোদ নাচ, ফুল ফোটার নাচ, ফল পাকার নাচ—সব শিখেছে সে জীবজন্তুর কাছ থেকে। বনে বনে তাদের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে। আরো কত কী জানে! কাঠঠোকরা কোথায় বাসা বানায়, ডিম পাড়ে।...একবার সে এক কাণ্ড। বাবা-মা কাঠঠোকরা পাখি দুটোকে শিকার করে নিয়ে গেল ব্যাধ। বেচারা ছানাপোনার দল! কী খাবে! কে খাওয়াবে? ও রোজ গিয়ে তাদের মায়ের আদর নিয়ে বাবার যত্ন নিয়ে খাইয়ে দিয়ে আসত খাবার। কেউ জানতেও পারে নি। একদম চুপিচুপি। শেষবেলা একটু বড় হতে আলাদা জায়গায় বাসা বেঁধে তাদের লুকিয়ে রেখে দিল। ব্যাধ ঘোরে ফেরে, টেরটিও পায় না। সে যা গোপন গাছের কোটর! সেই থেকে ছানাপোনাগুলো তার ভারি বাধ্য। এনে দেখাতে পারে রাজকুমারীকে। একবার বললেই হল। খুব ভালো লাগবে রাজকুমারীর। সন্তুষ্ট হবে।

আরো কত কী আছে অবাক করবার। আছে খরগোশ। মানুষের পায়ের শব্দ পেল কি পেল না, অমনি গিয়ে লুকোবে ঘাসের আড়ালে। আছে ল্যাজঝোলা পাখি। এই এত্তোবড় লেজ। আর কালো কুচকুচে ঠোঁট। বসে থাকে যখন গাছের ডালে কী চমৎকার যে লাগে। দেখেছে এসব রাজকন্যে কোনোদিন! দেখেছে সজারু? গায়ের কাঁটা উঁচিয়ে যখন ঝমর-ঝমর করে হেঁটে যায়? কিংবা কাছিম? গুড়গুড়িয়ে হাঁটে আর মাথা দোলায়, ইতিউতি চায়। সব মজুত। সব তার নখদর্পণে। জঙ্গলে এলে একবার হয়। সব ঘুরে-ঘুরে দেখাবে রাজকুমারীকে। দেখেশুনে চলে গেলে হবে না কিন্তু। তার সঙ্গে খেলা করতে হবে। সারা-দিন। দুজনে মিলে খেলবে নাচবে গাইবে, রাত্তিরবেলা নিজের বিছানা ছেড়ে দেবে রাজকুমারীকে। রাজকুমারী শুয়ে ঘুমোবে। আর সে থাকবে পাহারায়। হুঁ হুঁ বাপু, জঙ্গল বড় বিপদের। দুজনে ঘুমিয়ে পড়লে শেষে যদি হয় একটা মুশকিল! যদি বুনো মোষ আসে দুদ্দাড় করে তেড়ে! যদি নেকড়ে আসে! অসম্ভব নয়। তবে সে থাকলে আসতে সাহস পাবে না। ভয় করে যে খুব। দেখলেই পালায়। তাইতো সারারাত জেগে দেবে পাহারা। তারপর রাত পোয়াবে। ভোর হবে। সূয্যি উঠবে আকাশে। টুকটুক করে জানলায় টোকা দিয়ে সে রাজকুমারীর ঘুম ভাঙাবে। তারপর আর কী! তারপর খেলা আর নাচ আর ছুটোছুটি। চৌপর দিন ধরে নাচ। একা লাগবে নাকি কন্যের? লাগার তো কথা নয়। জঙ্গল বলে কথা! কত গাছ কত পাখি কত জীবজন্তু। তার ওপর মাঝে মাঝে গুরুদেব দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। দেখেছে সে। সাদা ধপধপে একটা ঘোড়া। তারই পিঠে সাদা ধপধপে আলখাল্লা পরে কী একখানা বই পড়তে পড়তে গুরুদেব যান। পেছন-পেছন অন্যরা। কখনো যায় তীরন্দাজের দল। অদ্ভুত তাদের পোশাক। সবুজ টুপি, গায়ে হরিণের চামড়ার জামা, কাঁধে ধনুক তীর, আর হাতের কব্জিতে বসা বাজপাখি। বেশ লাগে দেখতে। সবচেয়ে ভিড় হয় মেলার সময়। সোজা পথ তো জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। সবাই এই পথেই আসে। যাবতীয় দোকানদার। আঙুরঅলা, ফুলঅলা, মদের দোকানি। সবাই। মাঝে মাঝে দল বেঁধে আসে কাঠকুড়ুনী জোয়ানের দল। কাঠকুটো কুড়িয়ে তাই জড়ো করে আগুন জ্বালে, বসে থাকে গোল হয়ে তার চারদিকে, ঘুমোনো খাওয়া সব আগুনের ধারে বসে

বসেই। শেষবেলা আগুন নেভে। তখন সব কাঠ পুড়ে কাঠকয়লা। মোট বেঁধে সেই কয়লা নিয়ে যায় শহরে। বিক্রি করে। কদিন সে যে কী হৈ চৈ। শুনে গোপন-গুহা থেকে বেরিয়ে আসে ডাকাতের দল। ওদের সঙ্গে গল্প করে, খোঁজখবর নেয়। হাসি-তামাশায় মজে। শুধু একবার গেছিল এক মস্ত শোভাযাত্রা। সামনে সাধু কয়েকজন। গান গাইছিল গুনগুন করে। ভারি মিষ্টি সেই সুর। এখনো যেন কানে লেগে আছে। হাতে পতাকা আর সোনার ক্রুশ। ঠিক তাদের পেছনেই রুপোর জরোয়া পোশাক-পরা একদল যোদ্ধা। তারপর সৈন্যসামন্ত। সবার মাঝখানে তিনজন মানুষ। তাদের খালি পা। গায়ে হলুদরঙের আলখাল্লা। তাতে নানারকম নকশা-আঁকা। হাতে তাদের মোমবাতি। জ্বলছে। মোটমাট কারা তারা কী ব্যাপার আজ অব্দি সে বুঝতে পারে নি। তবু কেমন যেন দুঃখ-দুঃখ ভাব। কেমন যেন থম-মারা গম্ভীর সেই মানুষগুলো। আজও চুপচাপ বসে থাকলে তাদের ছবি মনের আয়নায় ভেসে ওঠে।

মোটমাট জঙ্গল বলে যে একদম কিছু নেই, শুধু গাছ আর পাখি আর জন্তু এমন কিন্তু নয়। নানান দেখার জিনিস। নানান তার ধরন। খুঁজে-খুঁজে ঘুরে-ঘুরে সব দেখাবে রাজকুমারীকে। কিচ্ছু বাদ দেবে না। যখন আর ঘুরতে পারবে না, পা করবে টনটন, তখন আলগোছে তুলে নেবে দু-হাতে। আলতো করে শুইয়ে দেবে নদীর ধারে নরম ঘাসের ওপর। ফল এনে দেবে। খাবে কন্যা। কুঁচ এনে দেবে। লাল টুকটুকে তার রঙ। তাই দিয়ে মালা গেঁথে গলায় পরবে। ভালো না-লাগলে ছিঁড়ে ফেলে দেবে মালা, তখন আনবে সাদা কুঁচ। সাদাতেই মানাবে ভালো, কেননা জামাটামা তো সব সাদা। আর তেমনি ফুটফুটে গায়ের রঙ। এনে দেবে কাচপোকা। তাই দিয়ে টিপ পরবে। এনে দেবে ফুল, তাই দিয়ে করবে কানের ঝুমকো। মোটমাট সব দেবে, সব। শুধু যাওয়া চাই, যেতে রাজি থাকা চাই।

কিন্তু কথা হল এই যে তাকে নিয়ে এত ভাবনা, এত জল্পনা কল্পনা—সে কোথায়? কোন্ ঘরে?—হ্যাঁ গো শাদা গোলাপ তুমি জানো কন্যে এখন কোথায়? জবাব দিল না গোলাপ, মাথা নিচু করে গোঁজ হয়ে বসে রইল। অবাক কাণ্ড। এই তো রাজপ্রাসাদ। কী চুপচাপ চারদিক! যেন ঘুমে অচেতন এর ভেতরের মানুষগুলো। ঢুকব নাকি? কিন্তু কোন্ পথ দিয়ে ঢুকব? ফটক যে বন্ধ। জানলার খড়খড়ি সব টানা। তার ওপরে ভারী ভারী সব পর্দা। যাতে বাইরের রোদ কি তাপ একটুও ভেতরে না-ঢুকতে পারে। তবে উপায়? চক্কর মারল। এ-মাথা থেকে ও-মাথা। নজরে পড়ল ছোট্ট একটা দরজা। ঢুকল। বাপরে বাপ, এ যে মস্ত একটা হলঘর! আর কী দারুণ দেখতে! ভয়-ভয় করছে। জঙ্গলেও কখনো কোনোদিন এত ভয় করে নি। মেঝেতে কত রঙ-বেরঙের পাথর। কী তার বাহার, কী জেল্লা! কিন্তু জেল্লা দেখে তো লাভ নেই, রাজকন্যে কোথায়? কোথায় সেই মেয়ে? এগোল আরো খানিকটা। দ্যাখে সার-সার শ্বেতপাথরের মূর্তি। অদ্ভুত তো! তাকিয়ে আছে তারই দিকে, নিষ্প্রাণ চোখ। শুধু ঠোঁটের কোণে চাপা-হাসির ঝিলিক। যেন মরা চোখে তার রকম-সকম দেখে মজা পাচ্ছে, হাসছে।

শেষ মাথায় দেয়ালের গায়ে কালো কুচকুচে মখমলের মস্ত এক পর্দা। তাতে তারা-আঁকা, চাঁদ-আঁকা। দেখলে মনে হয় সত্যি চাঁদ। পর্দাটা যেন রাতের কালো আকাশ। বুঝেছি এবার! তুমি মেয়ে লুকিয়ে রয়েছ ঐ পর্দার আড়ালে। আমাকে ঢুকতে দেখেই এসে লুকিয়েছ। দেখতে হচ্ছে।

বলে পর্দাটা তুলল। কই, কেউ তো নেই। ও-ধারে আরেকটা ঘর। এটা তার ঢোকার দরজা। ঢুকল। বা রে বা, এ তো আরো সুন্দর আরো চোখ-ধাঁধানো! দেয়াল-জোড়া মস্ত ভেলভেটের পর্দা। তাতে ছুঁচের কাজ। আগাগোড়া একটা ছবি। এক শিকারি শিকার করছে বনে, সামনে এক হরিণ। সাতবছর নাকি লেগেছিল শিল্পীর পর্দাটা তৈরি করতে। শিকারি এ-রাজ্যেরই

রাজা। বর্তমান রাজার কোনো পূর্বপুরুষ। সবাই বলত পাগলা রাজা। নাকি মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে কাউকে কিছু না-বলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যেত বনে, শিকার করত। শিকার তার নেশা। এ-ঘরেই থাকত, তারপর কীভাবে যেন মারা যায়। এখন এ-ঘরে বসে মন্ত্রণা-সভা। ভারি গোপন। আর ভারি গুরুত্বপূর্ণ। তখন কেউ থাকতে পারে না ত্রিসীমানায়। ঘরের মাঝ বরাবর মস্ত একটা টেবিল আর তার চারধারে লালরঙের গদি-আঁটা মস্ত বড় বড় চেয়ার।

অবাক। যত দেখে তত অবাক হয়, চোখ ওঠে কপালে। আর ভয় করে। যাবে কি আর? আর কি এগোনো উচিত? যা থমথম নীরব নিঃশব্দ চারিদিক! যদি কেউ দেখে ফেলে! যদি একটা কিছু ঘটে যায়! কিন্তু কোথায় রাজকুমারী। কোথায় কোন্ ঘরে সে? তার সাথে যে সে এসেছে দেখা করতে। বলবে একটি মাত্র কথা—তোমায় ভালোবাসি! যাবে আমার সঙ্গে বনে? না বলা অব্দি যে মনে শান্তি নেই।

পায়ের নিচে পুরু জাজিম। কী নরম। কী আলতো। হাঁটে যেন শূন্যে পা ফেলে। ঐ তো আরেকটা ঘর। ঢুকল। কেউ নেই। উদোম ফাঁকা।

তবে খুব সাজানো-গোছানো। উঁচু-উঁচু চেয়ার। একেকটা দেখতে সিংহাসনের মতো। আর তেমনিধারা টেবিল। এটা অতিথি-অভ্যাগতের সাথে দেখা করার ঘর। আসে তো ভিন্ রাজ্য থেকে কত মানুষ। রাজার সঙ্গে দেখা করবার আর্জি জানায়। যদি রাজি হন রাজা, তবে এই ঘরে আসেন, মুখোমুখি বসে কথা হয়। অপূর্ব পরিবেশ। ধপধপে শাদারঙের ছাদ। মাঝে মাঝে কালোর ছোপ। ঠিক মাঝখানে ঝুলছে মস্ত এক ঝাড়বাতি। তাতে একসাথে তিনশো মোম জ্বলতে পারে। ঠিক তার নিচে সোনার নিচে সোনার সুতোয় বোনা চাঁদোয়া। তাতে জরি দিয়ে আঁকা মস্ত এক সিংহের মুখ। তারই নিচে মস্ত সিংহাসন। কালো কুচকুচে তার রঙ। সেই রঙের মখমলে মোড়া। তাতে রুপো আর মুক্তোর ফুল। সে কি একটা—অজস্র। গুণে শেষ করা যায় না। উঁচু পাটাতনের ওপর বসানো। মেঝে থেকে উঠতে মোট তিনটে ধাপ। ওপর থেকে প্রথমধাপে বাঁদিক ঘেঁষে ছোট্ট আরেক সিংহাসন। তাতে বসে রাজকুমারী। আর সব থেকে নিচের ধাপে বসে নানসিও। রাজার পার্শ্বচর। বাইরের কোনো অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় ছায়ার মতো রাজার পাশে-পাশে থাকে। একলা সে-ই। আর কারো অধিকার নেই সেই ঘরে থাকার। ঠিক সিংহাসনের মুখোমুখি দেয়ালে রাজা পঞ্চম চার্লসের শিকারি-বেশে বিশাল এক পূর্ণাবয়ব ছবি। পায়ের কাছে মরা একটা বাইসন। বাঁদিকের দেয়ালে দ্বিতীয় ফিলিপের ছবি। একধারে হাতির দাঁতের বিশাল এক আলমারি। তার সামনেটা পুরো কাচ দিয়ে ঢাকা। ধাপে-ধাপে তার হাতির দাঁতের মূর্তি। সে যে কত। সব নাচের ভঙ্গিমা। সবাই বলে রাজা নাকি নিজের হাতে ওগুলো বানিয়েছেন।

কিন্তু কী হবে এসব আড়ম্বর দেখে। সে তো এই জন্যে আসে নি। কোথায় রাজকন্যা। তাকে যে ভারি দরকার। যদি হুট করে চলে যায় নাচ দেখতে। বিকেলবেলা যে ফের নাচের আসর বসার কথা। তখন তো আর কথা বলার ফুরসুত হবে না। নাচ শেষ হলে যাবে কি বনে আমার সাথে? রাজি হবে নির্ঘাৎ। এই চাপা গুমোট ভাব। চারদিকে বড় বড় দেয়াল আর ঘর আর ঠাসাঠাসি। প্রাণ কি হাঁপিয়ে ওঠে না? মন কি মুক্তি চায় না? চাইতে বাধ্য। তাই তো জঙ্গলে যেতে বলবে। সেখানে অবাধ মুক্তি। আর শান্তি। আর ভালোবাসা। বুক টানলেই হু-হু বাতাস ঢুকবে শরীরে। মুক্ত বাতাস। ফিরফির করে যখন বয়ে যায় গাছ-পাতার ভেতর দিয়ে, তখন আনন্দে থরথর করে পাতাগুলো কাঁপে। কত খুশি। কত ফুল। তেমন একটা নামকরা নয়। প্রাসাদের বাগানে যতসব ফোটে, ততরকম নয়। তবু সে অনেক। অনেক তার রঙ। অনেক সুবাস। লিলিফুল ফোটে বসন্তের গোড়ার দিকে, ফিকে রঙ, বড় নরম লাগে

দেখতে। প্রাণ যেন ভরে যায়। ফোটে হলুদ রঙের করবী। গন্ধ নেই এতটুকু, তবু রঙ বড় মোলায়েম। চোখ বড় টানে। ফোটে অপরাজিতা। কী চমৎকার যে তার পাপড়ির গড়ন ! আর চাঁপা, আর জুঁই। সে অজস্র। বলে শেষ করা যায় না। ফোটে টকটকে পলাশফুল। ঝরে পড়ে গাছের নিচে। সারা নিচটা যেন লাল হয়ে যায়। ফোটে শিমুল। ফল ফেটে হালকা তুলো ভাসতে ভাসতে যায় বহুদূর। আর কাঠবাদাম ফুল তো দেখতে ঠিক তারার মতো। হুবহু তারা। ফুটে থাকে যখন সারাগাছ যেন তারায় তারায় বোঝাই। উঠল রাত্রে চাঁদ তো সাক্ষাৎ যেন আকাশ। যেন গাছটাই আকাশ-ভরা চন্দ্র-তারা। অপূর্ব ! লাগবে না কন্যের ভালো? লাগবে একশো-বার। কার না লাগে। তবে খেলতে হবে তার সঙ্গে, নাচতে হবে ! তবে না পরিপূর্ণ ভালোলাগা। সে ভারি আনন্দ।

ভাবতে ভাবতে আপনমনেই হেসে উঠল। বড় তৃপ্তির হাসি। সে ঘর পেরিয়ে হাসতে হাসতে ঢুকল পাশের ঘরে।

তবু বাঁচোয়া। সব ঘরের মধ্যে এটাই যা ঝলমলে, রোদ আলো বাতাস নিয়ে সবার চেয়ে আলাদা। আর সাজানোর কায়দাও অন্যরকম। দেয়াল জুড়ে লতাপাতার ছবি। তাতে পাখি বসে আছে, ঝুলছে ফল। যেন সত্যিসত্যি। ফুলের থোকাগুলো রুপো দিয়ে বানানো। একধারে চুল্লির তাকের ওপর দুটো ময়ূর। কটা আবার টিয়াপাখি গাছের ডালে ডালে। যেন সত্যি টিয়া। আশ্চর্য তো, এমন সুন্দর ছবিও হয় ! মেঝে পুরো নীলরঙের। ঠিক নীল নয়, সাথে একটু সবুজের ছোঁয়া। যেন সমুদ্র। গোটা মেঝেটা সেই সমুদ্রের জল। আর যেন কত দূর ! ডাইনে বাঁয়ে তার যেন শেষ নেই, অন্ত নেই। বেশ লাগছে দেখতে। আর অবাক কাণ্ড। এতক্ষণ খেয়াল হয় নি, দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ছোট্ট দেখতে কে একজন তাকে দেখছে। তাকেই। বুকটা ধক করে উঠল। তবে কি রাজকন্যে ! এগিয়ে গেল গুটিগুটি। সেই সে-ও এগোল।

তখন পষ্ট দেখতে পেল তাকে। কোথায় কন্যে ! এ তো এক দানো। কী কুচ্ছিত দেখতে ! দেখে নি এমন কাউকে কোনোদিন। বদখদ চেহারা। হাতের মাপ পায়ের মাপ অসমান। কুঁজো হয়ে আছে পিঠ। তাতে আবার মস্ত একটা কুঁজ। পা নয়তো যেন বাঁকা ধনুক। মস্ত মাথা। তাতে লোমের মতো মাত্র কগাছা চুল। দেখে রাগে ঘেন্নায় নাক কুঁচকাল। তখন হাসি পেল খুব। তাই হাসল। অমনি সে-ও। হাসতে হাসতে হাতটা তুলল। দানোও তুলল তার হাত। আশ্চর্য তো ! বেটা তো আচ্ছা নকুলে ! বলে মাথা নুইয়ে তাকে অভিবাদন জানাবার ভঙ্গি করল। দানোও একইভাবে তার দিকে মাথা নোয়াল।

এখন আর ভয় নয়, বিরক্তি নয়, বেশ অবাক ভাব। অবাক চোখ নিয়েই এগিয়ে গেল তার দিকে, দেখাদেখি দানোও ততটা এগোল। একেবারে মিলিয়ে মিলিয়ে পা ফেলা। সে থামল। সে-ও থামল। চিৎকার করে উঠল আনন্দে, দৌড়ে গেল সামনের দিকে, শূন্যে দু-হাত তুলল। দানোও হুবহু নকল করল তার প্রতিটি ভঙ্গি। দিল হাত বাড়িয়ে। তার হাতও এগিয়ে এল। ছুঁল। কী ঠাণ্ডা ! যেন বরফ। তখন ভয় লাগল। ধরবে নাকি চেপে। পরখ করে দেখবে ? ধরার চেষ্টা করল। পারল না। দুজনের মধ্যে শক্ত কী এক আড়াল। আর ভীষণ মসৃণ। কিছুতে সেই আড়াল পার হওয়া যায় না। অথচ কত কাছাকাছি দুজন। মুখ একেবারে মুখের গোড়ায়। শরীর শরীরের কাছে। ভয় তারও কিছু কম নয়। ঐ তো ভয়ার্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। একটু সাহস পেল। আলগোছে হাত বোলাল মাথায়। দেখাদেখি সে-ও। তখন মারল ঘুসি। নিমেষে তারও মুঠো ঘুসি হয়ে আছড়ে পড়ল। টনটন করছে হাতটা। যন্ত্রণা। যন্ত্রণা তারও মুখে। নির্ঘাৎ তারও হাতে ব্যথা লেগেছে। তখন পিছিয়ে এল। সে-ও পিছিয়ে গেল কম্পা।

অবাক লাগছে খুব। ভীষণ অবাক। কী এটা ? ঘরটাই বা কীরকম ? সব এখানে দুটো-দুটো।

ঠিক যেন যমজ। দেয়ালে ছবি। হুবহু সেই ছবি উলটো দিকের দেয়ালে। ঘরের মাঝখানে ঐ একটা চেয়ার। হুবহু আরেকটা চেয়ার ওধারে। এমনকি ঘরের ঢুকবার দরজার মাথায় ঘুমন্ত ঐ হরিণ—ঠিক আরেকটা হরিণ ওদিকে দরজার ওপরে।

এই কি প্রতিধ্বনি? মনে আছে একবার, পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডেকেছিল কাকে, হুবহু সেই ডাক ফিরে এল কানে। হু-ব-হু। এ কি তাই? কিন্তু স্বর ফিরে আসে কানে। তাই বলে স্বর কি কথা বলে, হাত তোলে, মুখ ভ্যাংচায়?

তখন বুকের কাছ থেকে বের করল সেই শাদা গোলাপ, দানোটাও বের করল। হুবহু একরকম দেখতে। পাপড়িগুলো অব্দি একরকম। এমনকি হাতে ধরার ভঙ্গিটি পর্যন্ত। চুমু খেল। সে-ও খেল চুমু। বুকে চেপে ধরল। দানোটাও কদর্য ভঙ্গিতে ফুল বুকের কাছে চেপে ধরল।

তবে দানো কি সে নিজে? দেখতে ঐরকম? ঐ কদাকার কুৎসিত ভঙ্গি? ঐ মুখ, ঐ চোখ? ঐ বেঢপ শরীর? সে যে কী দুঃখ তখন, কী জ্বালা, কী যাতনা! যেন ফেটে যাচ্ছে বুক টুকরো-টুকরো হয়ে। কান্না আসছে সারাশরীর ঘিরে। কান্না। কাঁদতে কাঁদতে মেঝেয় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। দমকে দমকে কেঁপে উঠছে শরীরের প্রতিটি রেখা। তার ধনুকের মতো বাঁকা পা কাঁপছে, কুঁজ কাঁপছে, মুখ কাঁপছে, কাঁপছে সারা অঙ্গ। ভুল করেছে সে। বুঝেছে ভুল। হাসছিল তখন ওরা সকলে নাচ দেখতে দেখতে, রাজকুমারীও হাসছিল—সব তার বেঢপ শরীরের বিচিত্র ভঙ্গিমা দেখে। তাকে ভালোবেসে নয়। কুৎসিতকে দেখে সবাই হাসে। হাসির অর্থ বিদ্রূপ। সে বোঝে নি। সে ভেবেছিল ভালোবাসা। হায় ভালোবাসা! কেন, কেন তার বাবা তাকে জন্মের পর মেরে ফেলে নি? কেন ফেলে আসে নি জঙ্গলে? তবে তো এই অপমানে, এই লজ্জার মুখে পড়তে হত না। আর এই যাতনা, ফুলটা লাগছে এখন অসহ্য। যেন ভারি পাথর। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল ফুল। ছড়িয়ে দিল ঘরে। আয়নার ছবিটাও হুবহু তাই করল। কাঁদতে কাঁদতে জ্বালা নিয়ে যন্ত্রণা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলল ফুল। ছড়িয়ে দিল ঘরের মেঝেয়। অসহ্য! দেখতে পারছে না ঐ ছবি। ঐ তার নিজের রূপ। দু-হাতে তাই মুখ ঢাকল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু। তপ্ত তার এক-একটি ফোঁটা। মুখ গুঁজে তখন কাঁদতে লাগল।

ঠিক তখনই ঘরে ঢুকল রাজকুমারী। সঙ্গে দলবল, বন্ধু-বান্ধব। ওমা, এটা আবার কে রে! সেই বিটলে বামনটা না? কী রকম করছে দ্যাখ্! সত্যিই অদ্ভুত। হাত মুঠো, পিঠের কুঁজটা উঁচু হয়ে আছে এতখানি। পা দুটো ধনুকের মতো বাঁকা। কান্নার দমকে মস্ত মাথাটা নড়ছে। যেন আরেক অদ্ভুত রঙ্গ। গলা ফাটিয়ে রকম-সকম দেখে সবাই হেসে উঠল।

রাজকন্যা বলল, কীরকম নাচছিল তখন! কী বিদঘুটে নাচরে বাবা। জন্মে আমি কখনো দেখি নি। লাগছিল যেন পুতুলের মতো। তবু পুতুলগুলোকে দেখলে লাগে স্বাভাবিক, আর ওর হাবভাব সব উদ্ভুটে।

শুনে সবাই হো হো করে আরেকবার হেসে উঠল।

মুখ তুলল না সে। একইভাবে পড়ে আছে মেঝেয়। হাতের আড়ালে মুখ। মেঝের দিকে চোখ। কান্না এখন কম। সব কান্না যেন শেষ হয়ে গেছে। শুধু ভেতরে একটা জ্বালা। কী যেন কী অদ্ভুত তীব্র এক অনুভূতি। সারা শরীরটা যেন তোলপাড় করছে। তারই দমকে একবার হাত মুঠো করে মেঝের পাতা জাজিমটা আঁকড়ে ধরল, উঠতে চেষ্টা করল যেন একটুখানি। পারল না, পড়ে গেল মেঝেয়। তার পর সব স্থির। আর একটুও নড়ল না।

রাজকন্যা বলল, এবার ওঠো। ঢের অভিনয় দেখলাম। নাচ দেখাও আমাকে। আমার বন্ধুরা এসেছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ নাচ। বন্ধুরা চিৎকার করে উঠল; তোমার বাঁদর-নাচ আরেকবার দেখব। ওঠো তো বাছাধন, উঠে পড়ো এবার।

বামন চুপ। সাড়া নেই, শব্দ নেই, একইভাবে পড়ে রইল উপুড় হয়ে।

তখন মেঝেয় পা আছড়াল রাজকুমারী। তার হুকুম তো কোনোদিন কেউ অমান্য করেনি। তাই রাগ। রাগে গমগম করতে করতে কাকুকে ডাকল। কাকু তখন বাগানে, সঙ্গে অমাত্য। কী যেন গভীর পরামর্শ চলছে। নির্ঘাৎ মেক্সিকো থেকে এইমাত্র এসেছে কী এক সংবাদ। তাই নিয়েই মন্ত্রণা। বলল, কাকু, ও কাকু, সেই বিটলেটা আমার ঘরের মেঝেয় শুয়ে আছে। ঘুমুচ্ছে বোধহয়। ডাকলাম, কত নাচ দেখাতে বললাম, মোটে সাড়া নেই। তুমি একটু ডাকো না।

এল কাকু। নিচু হয়ে চড় মারল তার গালে। হাতে ফুল-কাটা রূপোর সুতোয় বোনা দস্তানা। বলল, এ্যাই, ওঠ্। রাজকন্যা নাচতে বলছে নাচ দেখা।

তবুও সাড়া নেই। নড়াচড়া অব্দি বন্ধ। একইভাবে শুয়ে আছে তো শুয়েই রইল।

কাকু বলল, দাঁড়াও, কোতোয়ালকে ডেকে আনি। তোমার দরকার এখন ক-ঘা চাবুক। বলে গেল কোতোয়ালকে ডাকতে।

অমাত্য যায় নি। বসে আছে বামনের পাশে। মুখ গম্ভীর। থমথমে চোখ। হাত দিল তার বুকে। মাথা নাড়ল। উঠে দাঁড়াল। বলল, রাজকুমারী, তোমার বামন আর কোনোদিন নাচ দেখাবে না। কোনোদিন না। আর ওর পক্ষে নাচা সম্ভব নয়।

—কেন? আমি যে অত করে বললাম।

—উপায় নেই। ওর বুকটা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। মানে হৃদয়। তা আর কোনোদিন জোড়া লাগবে না।

—ধ্যাৎ। অসীম বিরক্তিতে রাজকুমারী ভ্রূ কোঁচকাল। তোমরা কেউ আমার কথা শোনো না। এবার থেকে যারা নাচ দেখাতে আসবে, তাদের যেন বুক না থাকে। তোমার ঐ হৃদয়। তাহলে কিন্তু আমি খুব রাগ করব।

বলে হাসতে হাসতে দলবল নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একদম সিধে বাগানে।

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলা ভাষা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি 'চিরায়ত গ্রন্থমালা' র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র